তিন গোয়েন্দা সি্রিজ

চোরের আস্তানা

রাকিব হাসান

স্বীকরোক্তিঃ তিন গোয়েন্দার বাংলায় এই **e-book** টি তৈরিতে সব ধন্যবাদ সেবা প্রকাশনীর প্রতি। তিন দেশের বাঙ্গালি পাঠক যেন ইন্টারনেট থেকে সহজে ডাউনলোড করে পড়তে পারে সেজন্য এই চেষ্ঠা। ছবির **Resolutions** হাই রেখে **Quality** ৫০% কম করে ফাইল ছটো করছি, এই জন্য আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমাপ্রথী।

Book Scanned By: Saurav

Feedback: saurav2015@gmail.com

Best Viewed at 128%

চোরের আস্তানা

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

গ্রীনহিলস।

কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে বসে গল্প করছে তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে রয়েছে ফারিহা আর কিশোরের কুকুর টিটু। দলে যুক্ত হয়েছে আরও তিনজন: অনিতা, ডলি আর বব। গ্রীনহিলস স্কুলে পড়ে। মুসা আর রবিনের বন্ধু। গোয়েন্দাগিরির বেজায় শখ। বহুদিন ধরে মুসা আর রবিনকে চাপাচাপি করে কিশোরকে রাজি করিয়ে দলে যোগ দিয়েছে। 'বড়দিনের ছুটি'তে একটা কেসে কাজও করেছে। ওদের ওপর মোটামুটি সন্তুষ্ট এখন কিশোর। কাজেই তিন গোয়েন্দার যে কোন আলোচনায় এখন ওরাও অংশ গ্রহণ করে।

বড় একটা জগে কমলার রস তৈরি করে রাখছে ফারিহা। একটা প্লেটে রয়েছে সাতটা বার্গার। আর একটা বড় ডগ বিস্কুট।

প্লেটের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না টিটু। যেন, তার ভয়, লাফ দিয়ে উড়ে চলে যাবে বিস্কুটটা।

টিটু ছাড়াও আড়চোখে আরও অনেকে বার্গারের দিকে তাকাচ্ছে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ফারিহা, তোমার রস বানানো শেষ হয়েছে? হলে দিয়ে দাও।' বার্গারের প্লেটটা তুলে নিল সে। এক এক করে দিতে লাগল সবাইকে। ডগ বিস্কুটটা টিটুর দিকে ছুঁড়ে দিল সে। মুখ হাঁ করে লুফে নিল টিটু।

কুড়মুড়, মচমচ নানা রকম শব্দ শোনা যেতে লাগল। সবার চিবানোর শব্দ।

'হ্যাঁ, বলো এবার,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যময় কিছু নজরে পড়েছে কারও?'

না, কারও কিছু নজরে পড়েনি। জানাল সবাই।

অনিতা তাকাল কিশোরের দিকে। 'ছুটির আটাশ দিন হয়ে গেল। কিছুই ঘটছে না আর গ্রীনহিলসে। বড় বিরক্তিকর। কোন রহস্যই যদি না থাকল, গোয়েন্দা সেজে বসে থাকার আর মানেটা কি?'

গ্লাসে কমলার রস ঢালতে ঢালতে ফারিহা বলল, 'আমিও অনিতার সঙ্গে একমত। বসে বসে আড্ডা দিয়ে আর খেয়ে খেয়ে মোটাই হচ্ছি কেবল। কিছু

একটা করতে না পারলে আর সময় কাটছে না।'

'কি করতে চাও?' একটা গ্লাস তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রহস্য নেই, ঠিক আছে,' ফারিহা বলল, 'কিন্তু অন্য কিছু তো করতে পারি আমরা। রেড ইনডিয়ান সাজতে পারি। ছদ্মবেশে সন্দেহজনক লোকের পেছন পেছন গিয়ে দেখতে পারি, ওরা কোথায় যায়, কি করে। রহস্য একটা আবিষ্কার করেও ফেলতে পারি এ ভাবে।'

'তা রেড ইনডিয়ানটা কি ভাবে সাজব?' ডলির প্রশ্ন।

'কি ভাবে আর। পালক দিয়ে মুকুট বানিয়ে মাথায় পরব। মুখে রঙ মাখব। রঙচঙে কাপড় পরব। এ কোন কঠিন কাজ নাকি?'

'ভাল বুদ্ধি,' বলে উঠল বব। 'ইনডিয়ান সেজে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ব আমরা। দুই ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে যাব। তারপর তাড়া করব মুসাকে। মুসা লুকিয়ে পড়বে। ওকে খুঁজে বের করব আমরা। কারণ ও হবে ভিনদেশী। খুব মজা হবে।'

'থাক থাক, অত মজার দরকার নেই,' হাত নেড়ে মানা করে দিল মুসা। 'চারদিক থেকে আমার গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আর আমি মাটিতে চিৎপটাং। উঁহু, বাবা, ভাবতেই ভাল লাগছে না আমার।'

'ঝাঁপিয়ে পড়ব কেন?' ফারিহা বলল। 'শুধু খুঁজে বের করব তোমাকে। বনের মধ্যে ইনডিয়ান সেজে লুকোচুরি খেলা! সত্যি, দারুণ মজা হবে!'

কান খাড়া করে ফেলল টিটু। চাপা গরগর শুরু করল। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

'কে জানি আসছে,' বলে, উঠে গেল কিশোর। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খোয়া বিছানো পথে জুতোর শব্দ হলো। এগিয়ে আসছে। জোরে জোরে থাবা পড়ল দরজায়। এত জোরে, চমকে গেল সবাই।

ঘাউ ঘাউ শুরু করে দিল টিটু।

'কে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঝামেলা!' জবাব এল। 'তোমার কুত্তাটাকে ধরে বাঁধো। তারপর দরজা খোলো। কথা আছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা। গ্রীনহিলস গাঁয়ের পুলিশম্যান কনস্টেবল ফগর্‍্যাম্পারকট।

ফগ হঠাৎ? রহস্যের খোঁজ পেল নাকি?

'অ্যাই, টিটু, থাম!' ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল কিশোর। আস্তে করে

খুলে দিল দরজাটা।

ঘরের ভেতরে উঁকি দিল ফগ। গোল আলুর মত গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল। 'বাহ্, সবাই আছ দেখছি। কিসের আলোচনা হচ্ছিল? কোন রহস্য?'

'না, এমনি বসে বার্গার খাচ্ছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা তো ভাবলাম, আপনিই বোধহয় কোন রহস্যের খোঁজ দিতে এসেছেন।'

'না, তা নয়,' ফগ বলল। 'ক'দিনের ছুটি নেবার ইচ্ছে। ভাবলাম, নেয়ার আগে একবার খোঁজ নিয়ে যাই, কোন রহস্য আছে কিনা। তাহলে আর নিতাম না। সমাধানটা একেবারে করে তারপরেই নিতাম।'

'দুঃখিত,' কিশোর বলল। 'কোন রহস্যের খোঁজ নেই আমাদের কাছে। সেই আলোচনাই করছিলাম। প্রায় একটা মাস নিরামিষ বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'অ!' হতাশ মনে হলো ফগকে। 'তাহলে আর অকারণে বসে থেকে কি করব। ছুটি নিয়ে বরং বাইরে থেকে একবার ঘুরেই আসিগে। চলি, গুড-বাই।'

ঘুরে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল আবার ফগ।

তার গোড়ালি কামড়ানোর জন্যে পাগল হয়ে গেল টিটু। কিশোরের একটা চড় খেয়ে শান্ত হলো।

কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকাল আবার ফগ। 'আমি বেলা একটা পর্যন্ত আছি। এর মধ্যে কোন কেস পেলে ফোন করে জানিও আমাকে।'

তারপর আর থামল না সে। দ্রুতপায়ে গেটের দিকে চলে গেল। সাইকেলটা রেখে এসেছে গেটের বাইরে।

দরজাটা লাগাল না আর কিশোর। চুপি চুপি ফিরে এসে আড়ি পাততে পারে ফগ। সে-সুযোগ দিল না তাকে।

দুই

বেলা আড়াইটায় আবার কিশোরদের ছাউনিতে মিলিত হলো ওরা।

বলা বাহুল্য, কোন কেস পায়নি। অতএব ফগকেও ফোন করা হয়নি। আশা করল সবাই, ও ছুটি নিয়ে চলে গেছে। ঝামেলা গেছে। নইলে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে থাকত।

রেড ইনডিয়ান সেজে এসেছে সবাই। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল ওরা। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে নিজেকে কেমন লাগছে।

ভয়ঙ্কর চেহারার একটা কুড়াল তুলে নিল কিশোর। ফারিহা তো ভয়ই পেয়ে গেল দেখে। হেসে জানাল কিশোর, আসল কুড়াল নয়। কাঠ দিয়ে তৈরি। রূপালী কাগজ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে ফলাটা। নাটক-থিয়েটারে এ সব জিনিসই ব্যবহার করা হয়।

'চলো, এবার রওনা হওয়া যাক,' বলল সে। 'হেয়ার ফরেস্টে যাব আমরা। ফারিহা আর ববকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। রবিনের সঙ্গে যাবে অনিতা আর ডলি। দুই দলই মুসাকে খুঁজে বের করে ধরার চেষ্টা করব। দেখা যাবে, কারা আগে পারে।'

'হুঁ, কারা আগে পারে,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। ব্যাপারটা এখনও পছন্দ হচ্ছে না তার। 'খুঁজে বের করে গাছের সঙ্গে বেঁধে তীর মারা শুরু করো, তারপর মরি আরকি আমি। তোমাদের জন্যে খেলা বটে, আমার জন্যে মৃত্যু—ঈশপের সেই ব্যাঙের গল্পটার মত।'

'না, একেবারে মেরে ফেলা হবে না,' কথা দিল তাকে কিশোর।

অদ্ভুত ভাবে মুখে রঙ করেছে ওরা। মুসা বাদে। ববের হাতে একটা রবারের ছুরি। টিটুর গায়ে বসিয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল সে। সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর এক দল ইনডিয়ানের মতই মনে হচ্ছে ওদের।

হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা। মাঠের ওপর দিয়ে সরাসরি গেলে মাত্র আধ মাইল দূরে হবে। বনের একধারে একটা মস্ত প্রাসাদ আছে। নাম ওরিয়ন ফোর্ট। চারপাশ ঘিরে উঁচু দেয়াল।

'বনে গিয়ে আমার দল নিয়ে বাঁয়ে সরে যাব, রবিন যাবে ডানে,' কিশোর বলল। 'মুসা ঢুকবে মাঝখানে। ও যখন ঢোকে, চোখ বন্ধ করে রাখব আমরা। এক থেকে একশো গুনব। তারপর শুরু হবে খোঁজা।'

'আর আমাকে কি করতে হবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি আমাদের দেখার চেষ্টা করবে,' কিশোর বলল। 'যাকে দেখবে, তার নাম ধরে ডাক দেবে বেরিয়ে আসার জন্যে। সে তখন খেলা থেকে বাদ। কিন্তু যদি কেউ তোমার অলক্ষে গিয়ে তোমার কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে ওঠে, তুমি তখন তার বন্দি। এ রকম খেলার জন্যে উপযুক্ত জায়গা হেয়ার ফরেস্ট।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। নানা রকম গাছপালা, ঝোপঝাড়ে ভরা বনটা। ঘাসে ঢাকা। গুল্ম আর লতারও অভাব নেই। বড় গাছ, ছোট গাছ সব রকমের গাছই আছে। লুকানোর জায়গার অভাব নেই। এত বেশি ঝোপঝাড় আছে, ওগুলোর

আড়ালে থাকলে সহজে চোখে পড়বে না।

বনে পৌঁছে আলাদা হয়ে দুই দল দু'দিকে রওনা হয়ে গেল। বাকি দুই দিকের এক দিকে রয়েছে বেড়া, অন্য দিকে ওরিয়ন ফোর্টের দেয়াল উঠে গেছে খাড়া। চার দিক ঘেরা অবস্থায় ভেতর থেকে যদি সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে মুসা, চালাকই বলতে হবে তাকে।

বনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে। অপেক্ষা করতে লাগল। যেই কিশোর একটা রুমাল উঁচু করে ধরে চোখ বুজে একশো গোণা শুরু করল, একটা গাছের দিকে দৌড় মারল। যত দ্রুত পারল গাছ বেয়ে উঠে গেল ঘন ডালপাতার কাছে। একটা ডালের গোড়ায় লুকিয়ে বসে আপনমনে হাসল।

'যত পারো খোঁজো এখন।' আপনমনে বলল মুসা, 'খোঁজাই সার হবে। সারা বন চষে ফেলেও পাবে না আমাকে। তারপর ক্লান্ত হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে যখন বসে পড়বে, গাছ থেকে নেমে গিয়ে এমন এক চিৎকার দেব, বুকের ধড়ফড়ানি বন্ধ হয়ে যাবে।'

গোণা শেষ। ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ছয় জন রেড ইনডিয়ান। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল লতাগুল্ম, লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে।

ডালপাতার নড়া দেখেই বুঝে ফেলছে মুসা, কে কোথায় আছে। কারণ সে রয়েছে ওপরে। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। মুচকি মুচকি হাসছে। দারুণ মজা। নাহ্, চোর হওয়াটাই ভাল হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তার মজাটাই বেশি।

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। অবাক লাগল। ওরিয়ন ফোর্টের উঁচু দেয়ালের চূড়ায় একটা লোক। মুসা ভালমত তাকানোর আগেই লাফ দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ঝোপের মধ্যে শব্দ হলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর চুপ। লোকটাকে আর একবারের জন্যেও দেখা গেল না।

ঘটনাটা কি? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে। দেয়ালের ওপর কি করছিল লোকটা?

কি করবে বুঝে উঠতে পারল না মুসা। চিৎকার করবে? এই সময় দেখতে পেল কিশোরকে। লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেদিকে এগিয়ে চলেছে। নিশ্চয় শব্দ কানে গেছে তার।

আসলেই গেছে। শব্দ শুনে কিশোর মনে করেছে, মুসা। ঝোপের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে। কাজেই সে-ও এগিয়ে চলেছে সেদিকে।

আপনমনেই হাসল আবার মুসা। কিশোর ভাবছে, ঝোপের ডাল সরালেই

রেখেছে লোকটা। মুসার এতটাই কাছে রয়েছে, তার হাঁপানোর শব্দও কানে আসছে মুসার।

পাথর হয়ে গেছে যেন সে। লোকটা কে? দেয়ালের ওপর কি করছিল? লুকিয়ে আছে কেন বনের মধ্যে? গোয়েন্দারা এখানে রেড ইনডিয়ান সেজে খেলতে আসবে জানা থাকলে কোনমতেই আসত না এখন হেয়ার ফরেস্টে, এটুকু পরিষ্কার।

মুখ তুলে তাকালেই তাকে দেখে ফেলবে। ভয়টা এ কারণেই পাচ্ছে মুসা।

নিচে সবাই ডাকাডাকি করছে। নেমে যেতে বলছে। সাহস পাচ্ছে না মুসা। জবাব দেয়ার সাহসও নেই। দম নিতেও ভয় পাচ্ছে, লোকটা যদি শুনে ফেলে। বার বার খোদাকে ডাকছে, যাতে হাঁচি চলে না আসে। কিংবা কেশে না ফেলে। ইঁদুরের মত স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছে কি ঘটে দেখার জন্যে।

লোকটাও তার মতই স্থির হয়ে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচে, ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। ইস্, সঙ্গে করে টিটুকে নিয়ে আসা উচিত ছিল–আফসোস করছে মুসা, সহজেই তাহলে লোকটার গন্ধ খুঁজে এখন চলে আসত গাছের গোড়ায়।

তাকে যে ফেলে আসা হয়েছে তার কারণও আছে। এত বেশি উত্তেজিত হয়, চেঁচামেচি করে, লুকোচুরি খেলা অসম্ভব। তা ছাড়া কে কোথায় আছে, নিমিষে গিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবে। খেলা খতম।

অনেক ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজি করেও মুসার সাড়া না পেয়ে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বাড়ি চলে গেছে সে। চলো, আমরাও চলে যাই। লোকটাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বোঝাই যাচ্ছে।'

হতাশ চোখে তাকিয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখল মুসা। বন থেকে বেরিয়ে সরু মেঠোপথে নামতে দেখা গেল ওদের।

লোকটাও দেখছে সবই। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে গাছ বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

ওপর থেকে ওর চাঁদি আর কান ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের গোড়ায় নেমে এত দ্রুত আবার হারিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে আর কিছুই দেখতে পেল না মুসা।

লোকটা নেমে যাওয়ার পরও আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সে। আর কোন সাড়া পেল না লোকটার। কি করবে এখন? নেমে যাবে? সারারাত তো আর বসে থাকা যাবে না গাছের ওপর!

চার

গাছ থেকে নেমে পড়ল মুসা। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সাবধানে তাকাতে লাগল চারপাশে। কাউকে দেখা গেল না। লোকটা নেই।

'খিচে একটা দৌড় মারা দরকার,' ভাবল সে। আরেকবার চারপাশে তাকিয়েই মারল দৌড়। কেউ বাধা দিল না ওকে। কেউ চিৎকার করল না। মাঠের মধ্যে বেরিয়ে দৌড়ানোর সময় লজ্জাই পেল, এত ভয় পেয়েছে বলে, যখন দেখল গরুগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

সোজা চলে এল কিশোরদের বাড়িতে। নিশ্চয় এখনও আছে সবাই। বাগানের পথ ধরে ছুটল ছাউনির দিকে। দরজাটা বন্ধ। ভেতর থেকে কথার শব্দ আসছে।

দরজায় জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করল সে। 'এই, জলদি খোলো! আমি!'

দরজা খুলে দিল কিশোর। 'এসো, ভেতরে এসো। বনের মধ্যে এত চেঁচান চেঁচালাম, জবাব দিলে না কেন? শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি,' ঘরের ভেতর পা রেখে বলল মুসা। 'খবর আছে। দারুণ খবর।'

'কি?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল সবাই। মুখের রঙ মুছতে মুছতে থেমে গেল কেউ কেউ।

'কিশোর যখন ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে ডাকতে লাগল,' মুসা বলল, 'সবই শুনেছি আমি। কাছেই ছিলাম। গাছের ওপর।'

'ও, ঠকিয়েছ!' বলে উঠল ডলি। 'এটা তো রেড ইনডিয়ান খেলার নিয়ম নয়?'

'কে বলল নিয়ম নয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল মুসা। 'রেড ইনডিয়ানরা কি গাছে চড়তে পারে না নাকি? যাকগে, তোমার সঙ্গে বকবকানির সময় নেই। আসল কথা বলি। গাছে চড়ে বসে ছিলাম আমি। দেখি একটা লোক ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছে। আমার গাছটায় চড়তে শুরু করল। কিশোর যাকে দেখতে পেয়েছে সেই লোকটাই হবে।'

'বলো কি!' চেঁচিয়ে উঠল ডলি। 'তারপর? তুমি কি করলে?'

'কিছু না,' জবাব দিল মুসা। 'আমি অনেক ওপরে উঠে বসে ছিলাম। এত

ওপরে উঠল না সে। আমার নিচেই থাকল। কিশোর দেখার আগেই ওকে আমি দেখেছি। ওরিয়ন ফোর্টের দেয়ালের ওপর উঠেছিল। ওখান থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল ঝোপের মধ্যে।'

'তারপর?' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না ফারিহা। 'শেষে কি করলে?'

'তোমরা সবাই চলে গেলে লোকটাও নেমে পড়ল গাছ থেকে। ঝোপে ঢুকে হারিয়ে গেল। আমি তখন গাছ থেকে নেমে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বন থেকে। সত্যিই, খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'এ রকম আচরণ করল কেন লোকটা?' অবাক হলো রবিন। 'দেখতে কেমন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'শুধু কান আর মাথার চাঁদি দেখেছি ওর। কিশোর দেখেছে হয়তো।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখেছ?'

'দেখেছি, মোটামুটি,' কিশোর বলল। 'ঝোপের মধ্যে আলো কম ছিল। ক্লীন শেভ, কালো চুল–অতি সাধারণ চেহারা। মনে রাখার মত নয়।'

'তারমানে ধরে নিতে হবে ওর সঙ্গে এটাই আমাদের শেষ দেখা,' ডলি বলল। 'হাতের কাছে এসেও ফসকে গেল একটা রহস্য। লোকটা ওখানে কেন এসেছিল, কি করছিল, কোনদিনই জানতে পারব না আমরা।'

'আমাদের বিকেলটাও মাটি করল,' অনিতা বলল। 'তবে ও না এলেও মুসাকে খুঁজে বের করতে পারতাম না। এরপর যখন এ ধরনের খেলা খেলতে যাব আমরা, নতুন আইন করা উচিত–গাছে চড়া যাবে না।'

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ফারিহা বলল, 'আজ তো আর কথা বলার সময় নেই। এরপর কবে মীটিঙে বসছি আমরা?'

'বুধবার বিকেলে বসা যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'চোখ কান খোলা রাখবে সবাই। কোন রহস্যই যেন ফসকে না যায়। আজ লোকটাকে ধরতে পারিনি বটে, কিন্তু কোনদিনই পারব না জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি শিওর কোন ধরনের অকাজ করতে এসেছিল ওখানে সে।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে যার যার বাড়ি ফিরে চলল সবাই। মুসা বাদে রহস্যময় লোকটার কথা বিশেষ ভাবছে না আর কেউ। তবে রাতের সংবাদে লোক্যাল টিভির একটা খবর আবার কান খাড়া করে দিল সবার।

'ওরিয়ন ফোর্টের বর্তমান মালিক মিসেস মার্থা ওরিয়নের অপূর্ব সুন্দর, দামী একটা মুক্তার হার আজ বিকেল বেলা চুরি গেছে তার শোবার ঘর থেকে,' সংবাদ পাঠক পড়ল। 'বাড়ির কেউ দেখেনি চোরটাকে। কেউ কোন শব্দও শোনেনি। চুরি

করে নিরাপদে পালিয়ে গেছে সে।' শোনার সঙ্গে সঙ্গে সোফায় সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'তারমানে ওই ব্যাটাকেই দেখেছি আমরা!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এখুনি ফোন করা দরকার মুসাদেরকে!'

ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ নেই। মেরিচাচী রান্নাঘরে। রাশেদ পাশা স্টাডিতে, জরুরী কাজে ব্যস্ত। তার চিৎকার কানে গেল না কারও।

পাঁচ

সে-রাতে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে রইল গোয়েন্দারা সবাই। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় মীটিং ডেকেছে কিশোর।

পরদিন সময়মত হাজির হয়ে গেল সবাই। ছাউনিতে আগে থেকেই বসে আছে কিশোর। একেকজন করে এল, আর দরজা খুলে দিতে লাগল সে। সবাই হাজির হলে শুরু হলো মীটিং।

'ফগটা গেছে বাঁচা গেছে,' কিশোর বলল। 'নইলে ঠিক এতক্ষণে নাক গলানো শুরু করে দিত আমাদের এখানে। নেকলেস চুরির সমাধান নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারত না সে।'

'তা পারত না,' মুসা বলল। 'তবে ফগ না থাকাতে মজা অনেকখানিই মাটি হলো আমাদের।' ফগের নাম শুনে টিটুকে কান খাড়া করে ফেলতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, 'কি বলিস, টিটু?'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, তবে মুসার কথার জবাব দিল জোরাল স্বরে, 'খুফ! খুফ!'

'মুসা,' কিশোর বলল, 'কাল যে লোকটাকে দেয়ালে চড়তে দেখেছিলে তুমি, আমি যাকে ঝোপের মধ্যে দেখে ফেলেছি, আমার বিশ্বাস সেই লোকটাই চুরি করেছে মিসেস ওরিয়নের হারটা।'

'সত্যি!' চোখ বড় বড় করে বলল অনিতা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সে ছাড়া আর কেউ না। এখন কথা হলো, আমরা এখন কি করব? হারটা খুঁজে বের করতে পারলে, তারপর চোরটাকে ধরা গেলে, মন্দ হত না। ভালই একটা গোয়েন্দাগিরি হয়। কি বলো?'

দীর্ঘ নীরবতা। চুপচাপ ভাবতে লাগল সবাই। অবশেষে রব জিজ্ঞেস করল,

'কি ভাবে ধরবে? দেখেছ তো ওকে কেবল তুমি আর মুসা, তা-ও পলকের জন্যে, ভালমত দেখতে পারোনি।'

'তা ঠিক,' মুসা বলল। 'আমি তো চেহারাটাও দেখতে পাইনি। খালি তার কান আর চাঁদি। শুধু এটুকু দেখে কাউকে শনাক্ত করা অসম্ভব। তা ছাড়া ওকে ধরার জন্যে জনে জনে চাঁদি দেখে তো আর বেড়াতে পারব না।'

হেসে ফেলল ফারিহা। 'একটা মই সঙ্গে রাখলে জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্যে। যখনই সন্দেহজনক কাউকে দেখবে, তার কাঁধে মই ঠেকিয়ে উঠে গিয়ে চাঁদিটা দেখে আসবে।'

আরও দু'তিনজন হাসল তার কথায়।

রবিন বলল, 'পুলিশকে জানালে কেমন হয়?'

'জানাতে পারলে তো ভালই হত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কি বলব ওদের? কাজে লাগে এমন কোন তথ্য দিতে পারব না। দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি একটা লোককে, শুধু এটুকু বলে কোন লাভ নেই। তারচেয়ে আমার মনে হয় খানিকটা খোঁজ-খবর করে দেখা দরকার আমাদের, কিছু বের করতে পারি কিনা।'

'তবে আমার মনে হয়,' রবিন বলল আবার, 'পুলিশকে আগে জানিয়ে রাখা ভাল। তাহলে বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য চাওয়া সহজ হবে।'

ভোট নেয়া হলো। পুলিশের কাছে যাবার পক্ষেই ভোট বেশি পড়ল। সুতরাং ছাউনি থেকে বেরিয়ে শহরে রওনা হলো ওরা। ফগ নেই। তার জায়গায় সাময়িক কাউকে দেয়া হয়েছে কিনা, তা-ও জানে না। সরাসরি ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করারই সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

থানায় এসে বাইরের ঘরে ডিউটিরত এক তরুণ পুলিশ অফিসারকে ডেস্কে বসে থাকতে দেখা গেল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে? একটা বিশেষ খবর নিয়ে এসেছি আমরা। মিসেস মার্থা ওরিয়নের চুরি যাওয়া হারটার ব্যাপারে।'

তরুণ অফিসার মুখ খোলার আগেই কি কাজে যেন দরজায় বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাদের দেখে হাসি ফুটল মুখে। 'আরে, তোমরা! কি খবর?'

'ওই চোরটার ব্যাপারে, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'কাল মিসেস ওরিয়নের হারটা যে চুরি করেছে। কাল বিকেলে ওকে বাড়ির বাইরের দেয়ালে চড়তে দেখেছে মুসা। দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে ঝোপে ঢুকেছিল। সেখানে আমি তাকে দেখে ফেলেছি। আমাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছে চড়ল। তার

আগেই সেটাতে উঠে বসে ছিল মুসা।'

প্রশ্ন করে করে প্রতিটি কথা ওদের কাছ থেকে শুনে নিলেন ক্যাপ্টেন। সন্তুষ্ট মনে হলো তাঁকে। বললেন, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না, ওরিয়ন ফোর্টের ওই সাংঘাতিক উঁচু দেয়ালে চড়ল কি করে সে? বানরের মত বাইতে পারে নাকি? মই ব্যবহার করেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, আমার কাছে এসে যে খবরটা দিয়ে গেলে, সে-জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের। চোখ খোলা রেখো। বলা যায় না, আবার সামনে পড়ে যেতে পারে লোকটা।'

'কিন্তু সামনে পড়লেও তাকে চিনব কি করে বুঝতে পারছি না,' ক্যাপ্টেনের উপস্থিতিতে যেন নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর। 'আমি দেখেছি এক পলকের জন্যে। খুবই সাধারণ চেহারা। মুসা দেখেছে শুধু ওর চাঁদি আর কান। যাই হোক, চেষ্টার ত্রুটি করব না। যে করেই হোক খুঁজে বের করার চেষ্টা করব লোকটাকে।'

থানা থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় নামল ওরা।

'এখন আমরা সোজা সেই জায়গাটায় চলে যাব,' কিশোর বলল, 'যেখানে লোকটাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে মুসা। কোন না কোন সূত্র নিশ্চয় পেয়ে যেতে পারি, কে জানে!'

ছয়

দল বেঁধে আবার হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা, আগের দিন বিকেলে যেখানে রেড ইনডিয়ান খেলতে গিয়েছিল।

'ঠিক কোনখানে লাফিয়ে পড়েছিল লোকটা; দেখাও তো?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভালমত দেখল মুসা। একটা হলি ঝাড়ের দিকে আঙুল তুলল।

'ওই যে হলি ঝাড়,' বলল সে, 'আর ওই ওকের চারাটা। দুটোর মাঝখানে পড়েছিল।'

'এসো,' কিশোর বলল, 'কাছে গিয়ে দেখি।'

দলবল নিয়ে গাছ দুটোর মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। ওখান থেকে মুখ তুলে তাকাল দেয়ালের ওপর দিকে।

দশ-এগারো ফুটের কম হবে না। মই ছাড়া ওই দেয়ালে কি করে উঠল

লোকটা? সবচেয়ে লম্বা মানুষের পক্ষেও হাত তুলে দেয়ালের ওপরটা ধরা সম্ভব নয়। বেয়ে ওঠা অসম্ভব।

'এই যে, এখানে নেমেছিল,' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অনিতা। মাটির দিকে চোখ। হলি ঝাড়টা থেকে সামান্য দূরে গভীর দাগ হয়ে আছে।

সবাই দেখল।

'হ্যাঁ, পায়ের দাগই মনে হচ্ছে,' বব বলল। 'কিন্তু এ দিয়ে কি লাভ হবে? জুতোর পুরো ছাপটা বসলেও নাহয় কাজ হত। এ তো শুধু গোড়ালি।'

'দেয়ালের অন্যপাশে গেলে কেমন হয়?' কিশোর বলল। 'ভাগ্য ভাল হলে পুরো পায়ের ছাপই হয়তো পেয়ে যাব। চলো, গিয়ে মালীকে বলে কয়ে দেখি ঢুকতে দেয় কিনা। আমাদের দুধ দেয় যে লোকটা, তার বন্ধু ওই মালী। আমাকেও চেনে।'

'ভাল বুদ্ধি,' বব বলল।

কারও অমত নেই। সুতরাং বাড়ির গেটের দিকে রওনা হলো ওরা। সামনের বাগানে কাজ করছে মালী। লোহার বিশাল গেটটার কাছেই। ডাক দিতে মুখ তুলে তাকাল।

'বিটেল,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'আমাদের একটু ঢুকতে দেবেন? চোরটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি। কাল বিকেলে ওকে বনের দিকের দেয়ালের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি। পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বলল চোখ খোলা রাখতে। সে-জন্যেই সামান্য খোঁজ-খবর করতে এসেছি।'

হাসল বিটেল। গেট খুলে দিল। 'তোমাদের সঙ্গে এলে নিশ্চয় কোন অসুবিধে হবে না? আমার মাথায়ই ঢুকছে না অত উঁচু দেয়াল টপকাল কি করে লোকটা! কাল বিকেলে সারাক্ষণই এখানে কাজ করেছি আমি। গেট দিয়ে ঢুকলে দেখতে পেতাম। এদিক দিয়ে আসেনি।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল গোয়েন্দারা। সঙ্গে এল বিটেল। দেয়ালের ওপর দিয়ে হলি ঝাড় আর ওকের চারার মাথাটা দেখতে পেল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল।

'এখানেই দেয়ালের ওপর দেখেছি তাকে,' বলল সে। 'পায়ের ছাপগুলো আছে কিনা এখন দেখা যাক।'

দাগ পাওয়া গেল মাটিতে। তবে পায়ের ছাপ নয়।

ঝুঁকে ভাল করে দেখতে লাগল সবাই দাগগুলো।

'অদ্ভুত, তাই না?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'গোল গোল, তিন ফুট চওড়া, ঝাড়ুর মাথা দিয়ে খুঁচিয়েছে যেন কেউ মাটিতে।...না, খোঁচায়নি, চাপ

দিয়েছে। দাগগুলোর দূরত্ব একটা থেকে আরেকটার প্রায় সমান। জুতোর গোড়ালি হতেই পারে না। কিসের দাগ এগুলো, বিটেল, বলতে পারেন?'

'না, পারব না,' বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল বিটেল।

সবাই তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। গোল দাগগুলোর রহস্য ভেদের চেষ্টা করছে। যতই দেখছে, ততই স্থির নিশ্চিত হচ্ছে, লোহার গোল আংটা পরানো ঝাড়ুর মাথা দিয়ে মাটিতে জোরে জোরে চাপ দিয়েছে কেউ। কিন্তু এ কাজ কেন করল? ঝাড়ুর সঙ্গে দেয়ালে চড়ারই বা কি সম্পর্ক?

'মই যে ব্যবহার করেনি, বাজি রেখে বলতে পারি,' বিটেল বলল। 'আমাদেরগুলো সব ছাউনিতে তালা দিয়ে রেখেছি। চুরির খবর শোনার পর গিয়ে দেখেও এসেছি ওগুলো। যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে সব। চোরটা কি করে দেয়ালে চড়ল, আমার মাথায় ঢুকছে না কোনমতেই।'

'আমার মনে হচ্ছে লোকটা দড়াবাজিকর,' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ফারিহা। চোখে পড়ল একটা জিনিস। উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'দেখো দেখো, কি ওটা?' হাত তুলে বলল সে। 'ওই যে, দেয়ালের ওপরের দিকে ইঁটের কোনাটা বেরিয়ে আছে যে ওটাতে।'

সবাই তাকাল।

'উলের মত মনে হচ্ছে,' অনিতা বলল। 'মনে হয় চড়ার সময় চোরটার কাপড়ে ইঁটের খোঁচা লেগেছিল। ছিঁড়ে আটকে গেছে সুতোটা।'

'দেখি, এখানে এসো তো, মুসা,' বলে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও। তোমার কাঁধে চড়ে নামিয়ে আনি ওটা। জরুরী সূত্র হতে পারে।'

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। মুসার কাঁধে চড়তে কিশোরকে সাহায্য করল রবিন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল কিশোর। ইঁটের কোনা থেকে খুলে নিল উলের টুকরোটা। লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। দেখার জন্যে ঘিরে এল সবাই। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

খুব সাধারণ একটা জিনিস। নীল রঙের উলের সুতো, তাতে এক গাছি লাল সুতোও রয়েছে। গভীর মনোযোগে সুতোটা দেখতে লাগল সবাই।

'মনে হচ্ছে চোরটার জারসি থেকে ছিঁড়ে রয়ে গেছে,' অবশেষে বলল কিশোর। 'তারমানে এখন নীল রঙের একটা পুলওভার পরা লোককে খুঁজতে হবে আমাদের। পোশাকটায় লাল রঙের সুতোও আছে।'

এরপর আরও একটা জিনিস খুঁজে পেল ওরা। উত্তেজনা বাড়ল তাতে।

সাত

সূত্রটা খুঁজে বের করল টিটু। শুরু থেকেই মাটি শুঁকে চলেছে সে। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে এদিকে শোঁকে, ওদিকে শোঁকে। মাটিতে বসে যাওয়া গোল চিহ্নগুলো শুঁকতে শুঁকতে আচমকা ঘাউ ঘাউ শুরু করল সে।

সবাই তাকাল ওর দিকে।

'কি হয়েছে, টিটু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চিৎকার করতেই থাকল কুকুরটা। খানিকটা ঘাবড়েই গেল মেয়েরা–ফারিহা, অনিতা আর ডলি। এমন করে চেঁচাচ্ছে কেন? চারপাশে তাকাতে শুরু করল ওরা। যেন ভয় পাচ্ছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখবে কাউকে।

ওপর দিকে মুখ তুলে পাগলের মত চিৎকার করেই চলল টিটু।

'আরে থাম!' ধমক লাগাল কিশোর। 'কি দেখেছিস বলবি তো? থাম্ না! আহ্!'

টিটুর দেখাদেখি সবাই মুখ তুলল। দেখতে চাইল কি দেখে অমন চিৎকার করছে কুকুরটা। ওরাও দেখতে পেল। একটা সরু ডালের ভাঙা শুকনো মাথায় আটকে রয়েছে একটা ক্যাপ।

'আরি! ক্যাপ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'চোরের নাকি?'

'চোর ওটা ওখানে ছুঁড়ে দিতে যাবে কেন?' ফারিহার প্রশ্ন। 'চোরেরা নিশ্চয় পালানোর সময় গাছের ডালে ফেলে রেখে যায় না তাদের ক্যাপ!'

এত উঁচুতে, ক্যাপটার কাছে পৌঁছানো মুশকিল। দেয়ালের মাথা যতটা উঁচুতে, তার চেয়ে বেশি। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্যে একটা লাঠি আনতে গেল বিটেল।

'ছুঁড়ে মেরেই কেবল ওখানে ঝোলানো সম্ভব,' বব বলল। 'এ থেকেই বোঝা যায় ক্যাপটা চোরের নয়। কোন চোর এ ভাবে ক্যাপ রেখে যাবে না। নিজেকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে এ রকম মূল্যবান সূত্র।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল, 'চোরের ক্যাপ এটা না-ও হতে পারে। নিশ্চয় কোন ভবঘুরে দেয়ালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ছুঁড়ে ফেলেছিল।'

একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ফিরে এল বিটেল। ওটার মাথা দিয়ে খোঁচা মেরে

মাটিতে ফেলল ক্যাপটা। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টিটু।

'ফেল, টিটু; রেখে দে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

মুখ থেকে ফেলে দিল টিটু। আহত মনে হলো তাকে। এ রকম ব্যবহার করা হলো কেন তার সঙ্গে? ক্যাপটা সে-ই তো আবিষ্কার করেছে। করেনি? একবার অন্তত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল তাকে।

ময়লা পুরানো ক্যাপটা দেখতে লাগল গোয়েন্দারা। মোটা সুতো দিয়ে বানানো। এক সময় খোপ খোপ ডিজাইন ছিল। এখন এতই ময়লা, দেখাই যায় না প্রায়।

মুখ বাঁকিয়ে জিনিসটার দিকে তাকাল ফারিহা। 'উঁহু, কি ময়লার ময়লা রে! ভবঘুরেটাও বোধহয় মাথায় রাখতে পারছিল না আর, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল দেয়ালের ওপর দিয়ে। গাছে গিয়ে আটকেছে। এটা কোন সূত্র না।'

'আমারও মনে হয় না,' টুপিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'রেখে আর কি হবে। আমাদের কোন কাজে লাগবে না এটা। অত খুশি হওয়ার কিছু নেই রে, টিটু। এমন সাংঘাতিক কোন আবিষ্কার করে ফেলিসনি।'

ক্যাপটা দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল রবিন।

বাধা দিল কিশোর। 'রাখো, রাখো! ফেলে দিও না। বলা যায় না কিছু। ফেলে দেয়ার পর যদি বুঝতে পারি মূল্যবান সূত্র ছিল এটা, পরে তাহলে মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া উপায় থাকবে না। যদিও এখন কোন রকম সূত্রই মনে হচ্ছে না এটাকে আমার কাছে।'

'এই দুর্গন্ধওলা টুপি তাহলে তোমার কাছেই থাক,' কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন। 'বাপরে বাপ, কি বিটকেলে গন্ধ! নোংরার হদ্দ লোকটা!'

নির্বিবাদে টুপিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর। নীল উলের সুতোটা সাবধানে ভরে রাখল নোটবুকে। তারপর মাটির দিকে তাকাল আবার, গোল গোল দাগগুলোর দিকে।

'আমার মনে হয় এগুলোরও একটা নোট রাখা দরকার,' মুখ তুলল সে। 'কারও কাছে মাপার কোন কিছু আছে?'

ববের কাছে একটা সুতোর গোলা পাওয়া গেল। সাবধানে দাগগুলো মাপল কিশোর। সুতোয় গিট দিয়ে চিহ্ন রাখল যাতে বোঝা যায় দাগগুলো কতখানি চওড়া। প্রতিটি দাগই এক রকম, এক সমান, কোন হেরফের নেই। মাপা শেষ করে গিঁটের কাছ থেকে কেটে নিয়ে সুতোর এই টুকরোটাও নোটবুকে রেখে দিল।

'আমার মনে হচ্ছে এই দাগগুলোও কোন ধরনের সূত্র,' নোটবুকটা পকেটে

রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কি এগুলো, এখন কোন ধারণাই করতে পারছি না।'

বিটেলকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। মাঠের ওপরের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরে চলল। সূত্র যা পাওয়া গেছে, সেগুলো খুব একটা সুবিধের লাগল না ওদের কাছে। তবে হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর পাশা।

'আমি এখনও বলছি,' ফারিহা বলল, 'কোন দড়াবাজিকরের কাজ। সাধারণ লোকের পক্ষে ওই দেয়াল টপকানো অসম্ভব।'

মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠেছে ওরা। যেন ফারিহার কথার সমর্থনেই একটা দেয়ালের কাছে এসে দেখতে পেল বড় একটা পোস্টার লাগানো রয়েছে। নির্বিকার ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকাল ওরা। কিন্তু হঠাৎ এমন চিৎকার করে উঠল রবিন, চমকে গেল সবাই।

'দেখো কাণ্ড!' চিৎকার করে বলতে লাগল সে। 'আরে এ তো সার্কাসেরই পোস্টার। দেখো না কত কিছু আছে, সিংহের খেলা, ঘোড়ার খেলা, ভালুক, ভাঁড়···আর এই দেখো দড়াবাজিকর। দড়াবাজিকর, আরে! ফারিহা বলতে না বলতেই সার্কাস পার্টি এসে হাজির!'

'বলতে না বলতে নয়,' কিশোর বলল, 'ও বলার আগেই এসেছে ওরা। তাঁবুটাবু খাটানোর পর পোস্টার লাগিয়েছে।'

একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকল ওরা। ভীষণ উত্তেজনায় কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। সবার মনেই এক ভাবনা, ওখানেই গিয়ে খোঁজা দরকার। পারলে এখনই!

আট

ঘড়ি দেখল কিশোর।

'ধূর!' হতাশ কণ্ঠে বলল সে। 'লাঞ্চের সময় তো হয়েই গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। আড়াইটার সময় আবার আমাদের বাড়িতে চলে এসো সবাই। আলোচনায় বসব।'

'উঁহু,' ডলি বলল। 'আমি আর অনিতা পার্টিতে যাচ্ছি। না গিয়ে পারব না।'

'আমাদের বাদ দিয়ে মীটিংটা কোরো না, কিশোর,' অনুরোধ করল অনিতা।

'আমিও আসতে পারব না,' বব বলল। 'বাড়িতে জরুরী কাজ আছে, মা বলে দিয়েছে। মীটিঙে কাল বসলে কেমন হয়? চোরটা যদি সার্কাসের দড়াবাজিকরই হয়ে থাকে, তাহলে এক রাতে সে পালিয়ে যাচ্ছে না। সার্কাস যতদিন থাকে, সে-ও থাকবে।'

'সার্কাসের লোক হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। আমি আসলে কিছু ভেবে বলিনি,' ফারিহা বলল। 'আমার মনে হয়েছিল দড়াবাজিকরের পক্ষে সম্ভব। সার্কাস পার্টি এসে গেছে এখানে, জানিই না।'

'যাই হোক, তদন্ত করে দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'সার্কাস পার্টিটা এসেছে বলেই চুরিটাও হয়েছে, তার কারণ চোর ওখানেই লুকিয়ে আছে। সে যাকগে, এ সবই অনুমান। ঠিক আছে, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় আবার মীটিং। ইতিমধ্যে অনেক সময় পাবে ভাবার। সূত্রগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে কালকে জানিও কে কি ভেবেছ। সার্কাসে যাওয়ার কোন দরকার আছে কিনা, সেটাও ভেবে দেখো।'

সারাটা দিনই সেদিন ভাবল সবাই। এমনকি পার্টিতে বসেও ফিসফিস করে আলোচনা করল ডলি আর অনিতা।

'সার্কাসে গিয়ে খোঁজাটাই ঠিক হবে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' অনিতা বলল। 'তোমার কি মনে হয়, ডলি? দড়াবাজিকরদের দিকে নজর রাখা যাবে ওখানে গেলে। লোকটাকে দেখলে হয়তো চিনেও ফেলতে পারে কিশোর।'

পরদিন সকালে যখন কিশোরদের ছাউনিতে মীটিং বসল, আলোচনার শুরুতেই বলে উঠল বব, 'আমি সার্কাসে যাবার পক্ষে।'

'আমার আর অনিতারও একই মত,' ডলি বলল।

'আমিও,' রবিন বলল।

মুসা আর ফারিহাও সার্কাসে যাবার পক্ষে।

'তোমার কি মত, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গেলেই ভাল হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আজ বিকেল থেকে শুরু হচ্ছে শো। আমার ইচ্ছে, সবাই যাব আমরা। তবে বেশি আশা কোরো না। লোকটাকে মাত্র এক নজর দেখেছি, তা-ও ঝোপের ভেতরের আবছা অন্ধকারে। দড়াবাজিকরদের মধ্যে সে থাকলেও দেখে চিনতে পারার আশা খুবই কম।'

'তুমি বললে ক্লীন শেভ করা ছিল ওর,' মুসা বলল। 'কালো চুল। আমি দেখেছি চাঁদিতে বিচ্ছিরি একটা গোল টাক। তোমার দেখা আর আমার দেখা

মিলে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে চেহারার। তবে এটুকু দিয়ে কোন লোককে খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন।'

'টাকা আছে তোমাদের কাছে?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল অনিতা। 'সার্কাসের টিকেট কেনার? আমার কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই। যা ছিল সমস্ত দিয়ে কাল বার্থডে পার্টির উপহার কিনে নিয়ে গেছি।'

যার যার পকেট হাতড়ানো শুরু করল ওরা, কিশোর বাদে। যে যা পেল বের করে এনে সামনের একটা বাক্সের ওপর রাখল। টেবিলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাক্সটা।

গুনে দেখল কিশোর। বলল, 'অনেক কম। অসুবিধে নেই। বাকিটা আমি দিয়ে দেব।'

সবাই জানে ওরা, প্রচুর হাতখরচ পায় কিশোর। সব সময়ই টাকা থাকে তার পকেটে।

আরও খানিক আলোচনার পর কিশোর বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। সার্কাস শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে সার্কাসের মাঠে হাজির থাকবে সবাই। দেরি করবে না কিন্তু। লাল রঙের সুতোর মিশ্রণ আছে এমন নীল পুলওভার পরা কাউকে দেখলে তার ওপর নজর রাখবে। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, ওই রঙের উলের কাপড় ছিল চোরটার পরনে।'

কাঁটায় কাঁটায় সময়ে সার্কাসের মাঠে হাজির হয়ে গেল ওরা। টিকেট বক্সের কাছে গিয়ে সাতটা টিকেট কিনল কিশোর। ভীষণ উত্তেজিত সব। সার্কাস জিনিসটাই মজার, তার ওপর সেখানে যদি চোর খুঁজতে যাওয়া হয়, তাহলে তো আরও মজা।

ভেতরে ঢুকে সীটে বসল ওরা। চোখ বিশাল তাঁবুটার মাঝের গোল জায়গাটার দিকে। রিং। যেখানে সার্কাস দেখানো হবে। একটা বাঁশি বেজে উঠল। দ্রিম দ্রিম বাড়ি পড়ল ঢাকে। শুরু হলো ব্যান্ড। রিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

ঘোড়াগুলোকে ঢোকানো হলো। কেমন গর্বিত পদক্ষেপ ওদের। মাথায় বিশেষ ব্যবস্থায় খাড়া করে রঙিন পালক গোঁজা। একপাশে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো ওদের। এল ভাঁড়েরা। ডিগবাজি খেতে খেতে ঢুকল রিঙের মধ্যে। সমানে চিৎকার করছে। ভালুকগুলোকে আনা হলো এরপর। একের পর এক খেলোয়াড়েরা এসে ঢুকতে লাগল রিঙের মধ্যে। আন্তরিক হাসি হেসে স্বাগত জানাতে লাগল দর্শকদের।

দড়াবাজিকরদের খেলা দেখানোর অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইল গোয়েন্দারা। ভাঁড় আর ভেলকিবাজ আছে মোট পাঁচজন, দু'জন আছে রন-পায় চড়ে হাঁটে, সাইকেলের খেলা দেখানোর জন্যে আছে আরও পাঁচজন—তাদের বিচিত্র সাইকেলগুলো নিয়ে হাজির। এদের মধ্যে নিশ্চয় অনেকেই দড়াবাজির খেলা জানে, কিন্তু কে কে, বলা কঠিন।

'প্রথমে ঘোড়ার খেলা,' রবিন বলল। 'সঙ্গে ভাঁড়েরা তো থাকছেই। তারপর আসবে দড়াবাজিকরেরা।'

সুতরাং অপেক্ষা করে রইল ওরা। ঘোড়ার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিতে লাগল। ভাঁড়দের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে পানি এসে গেল চোখে। পেট ব্যথা করতে লাগল।

'এইবার আসবে দড়াবাজিকরেরা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'মুসা, খেয়াল রাখো!'

নয়

দড়াবাজিকরেরা এল। সোজা হয়ে পায়ে হেঁটে নয়। চার হাত-পা ছড়িয়ে শরীরটাকে চাকার মত ঘোরাতে ঘোরাতে। একজন এল দুই হাতে হেঁটে। পা তুলে শরীরটাকে উল্টো করে ঘুরিয়ে এনে এমন গোল করে ফেলল, মাথাটা ঢুকে গেল দুই পায়ের ফাঁকে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে।

কিশোরের গায়ে গুঁতো দিল মুসা। 'কিশোর, দেখো, এই লোকটার ক্লীন শেভ। কালো চুল। ঝোপের মধ্যে একেই দেখোনি তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, এ-ও হতে পারে। বাকি সবার তো দেখা যাচ্ছে গোঁফ আছে। একমাত্র এরই নেই। দেখা যাক, উঁচুতে লাফিয়ে ওঠার খেলা দেখায় কিনা।'

সাত জোড়া চোখ আঠার মত সেঁটে রইল যেন এই লোকটার গায়ে। বাকি সবার গোঁফ আছে যেহেতু, সন্দেহের তালিকা থেকে ওরা বাদ, কিন্তু এ লোকটার গোঁফও নেই, চুলও কালো। ওদের সন্দেহভাজন লোকটি এরই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

লাফিয়ে কি শূন্যে উঠতে পারে ও? খাড়া দেয়ালে কি ভাবে চড়তে হয়

দেখাবে ওদের? আগ্রহে ফাটতে ফাটতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। দড়াবাজিকরদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে দক্ষ, তার খেলা দেখেই বোঝা গেল। পালকের মত হালকা যেন ওর শরীর। রিঙের মধ্যে এমন করে লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে স্প্রিঙের সাহায্যে ছুঁড়ে মারছে শরীরটা, নেমে আসছে অতি আলতো ভঙ্গিতে, যেন মাটিই ছুঁতে চাইছে না পা।

দড়িতে হাঁটার ব্যাপারেও ভীষণ দক্ষ সে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে তাঁবুর প্রায় চূড়ার কাছাকাছি একটা লম্বা দড়ি টানটান করে বাঁধা হয়েছে। একটা লম্বা মই খাড়া করে দেয়া হয়েছে ওখানে ওঠার জন্যে। এমন ভাবে তরতর করে উঠে যেতে লাগল সেটা বেয়ে, মনে হতে লাগল বারো ফুট উঁচু একটা দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব এ লোকের পক্ষে।

'মনে হচ্ছে এই লোকটাই আমাদের চোর,' কিশোরের দিকে কাত হয়ে এসে ফিসফিস করে বলল ফারিহা।

সম্ভাবনা আছে। তবে হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। অন্য কাউকে সন্দেহও হচ্ছে না। তাই আর কারও ওপর নজর না দিয়ে এরপর আরাম করে বসে সার্কাস দেখতে লাগল ওরা।

খুব ভাল সার্কাস। খেলুড়ে ভালুকরা এল এরপর। নিজেরা নিজেরা বক্সিং খেলল খানিকক্ষণ। তারপর ঘুসোঘুসি শুরু করল ওদের ট্রেনারের সঙ্গে। একটা বাচ্চা ভালুক তার ট্রেনারের এতই ভক্ত হয়ে পড়েছে, এমন করে পা আঁকড়ে ধরে রইল, ছাড়তেই চায় না।

ফারিহার খুব দুঃখ হতে লাগল, ইস্, এ রকম একটা পোষা ভালুক ছানা যদি থাকত তার! অনিতার দিকে কাত হয়ে বলল, 'বড় সাইজের পুতুলের মত, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল অনিতা।

আবার খেলা দেখাতে এল দু'জন ভাঁড়। তাদের পর রন-পাওলারা। রন-পায় চড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। ওদের পেছনে লাগল ভাঁড়েরা। মুখ ভেঙচে, জিভ দেখিয়ে, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে এগোল ভাঁড়েরা। ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রন-পা থেকে। কিন্তু এতই দক্ষ রন-পাধারীরা, কোন মতেই ফেলা গেল না ওদের।

এরপর ভেতরে এনে ঢোকানো হলো শক্ত একটা খাঁচা। সিংহের খাঁচা। গর্জন করে উঠল সিংহগুলো। কুঁকড়ে গিয়ে পেছনে সরে যেতে চাইল ফারিহা।

'এগুলোকে আমার ভাল লাগছে না,' বলল সে। 'বাপরে, ওই সিংহটাকে

দেখো, টুলের ওপর চড়ছে। ভাবসাব ভাল না মোটেও, দেখেছ। ট্রেনারের ওপরই না লাফিয়ে পড়ে।'

কিন্তু পড়ল না সিংহটা। নিজের কাজ বোঝে ওটা। বাকি সিংহগুলোর সঙ্গে মিলে দারুণ সব খেলা দেখাতে লাগল। গরগর করছে, গর্জন করছে, মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ভাবে হিসিয়ে উঠছে, বেড়াল গোষ্ঠীর প্রাণীরা যা করে। খেলা দেখানো শেষ করে ট্রেনারের নির্দেশে এক এক করে খাঁচায় ফিরে গেল আবার ভয়াল প্রাণীগুলো।

তারপর ঢুকল বিরাট একটা হাতি। নানা রকম খেলা দেখানো শেষে যখন তার ট্রেনারের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে শুরু করল, বল ছুঁড়ে মারল দর্শকদের দিকে, ফেটে পড়ল যেন পুরো তাঁবু। হই-হট্টগোল, চিৎকার, হাততালিতে কানে তালা লাগার জোগাড়।

শো এতই ভাল লাগল গোয়েন্দাদের, খেলা শেষে আবার যখন মাঠে বেরিয়ে আসতে হলো, খারাপই লাগল।

'ইস্, সব সময়ই যদি আমাদের তদন্তটা হত সার্কাসে চোর ধরতে আসা, কি মজাই না হত তাহলে,' আফসোস করে বলল ফারিহা। 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার? কালো-চুল লোকটাই চোর? দড়াবাজিকরদের মধ্যে তো একমাত্র ও-ই সন্দেহভাজন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'বাকি সবারই গোঁফ আছে, কেবল ওই লোকটার বাদে। ওর সঙ্গে এখন কথা বলতে পারলে হত। মুখ ফসকে কোন সূত্র হয়তো দিয়েও ফেলতে পারে।'

'কিন্তু কথাটা শুরু করব কিভাবে ওর সঙ্গে?' ববের প্রশ্ন।

'খুব সহজ। আমরা গিয়ে ওর অটোগ্রাফ চাইব। মোটেও সন্দেহ করবে না সে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বব। কিশোরের বুদ্ধি তাকে অবাক করে। সমস্যার সমাধান যেন রেডি হয়ে থাকে ওর মগজে।

'দেখো দেখো,' ডলি বলে উঠল, 'ওই লোকটা না? ওই যে, ভালুকের ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলছে যে। হ্যাঁ, ওই লোকই। এখন কি চোরটার মত লাগছে ওকে?'

চোরের মত লাগছে কিনা এ জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'জলদি এসো! ওর সঙ্গে কথা বলার এইই সুযোগ। চোখ-কান খোলা রাখবে সবাই। কোন সূত্র যেন চোখ এড়িয়ে না যায়।'

প্রায় দৌড়ে এসে দড়াবাজিকরকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল লোকটা। 'আরে, কি চাও তোমরা?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল সে। 'দড়ির ওপর কি করে হাঁটতে হয় শেখার ইচ্ছে?'

'না।' খুব বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'আপনার অটোগ্রাফ, প্লীজ।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। রিঙের চেয়ে এখানে অনেক বেশি বয়স্ক লাগছে ওকে।

কিশোরের কথা শুনে হেসে উঠল লোকটা। লাল একটা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'তাঁবুর ভেতরে সাংঘাতিক গরম,' বলল সে। 'অটোগ্রাফ? দাঁড়াও, দিচ্ছি। আগে এই ভয়াবহ জিনিসটা খুলে নিই। মগজ গলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।'

এক টানে পরচুলাটা খুলে আনল দড়াবাজিকর। মাথাটা পুরোপুরি টাক। ওরা তো হাঁ।

দশ

বোকা হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। লোকটার একেবারে চাঁদিতে হাতে গোণা কয়েকটা রেশমের মত বাদামী রোঁয়া বাদে চুল বলতে আর কিছুই নেই মাথায়। এ লোক চোর নয়। মুসা যে লোকটাকে দেখেছে, তার কালো চুল, চাঁদির সামান্য পেছনে ছোট্ট গোল একটা টাক।

পরচুলাটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল মুসা। এমনও হতে পারে, এটা মাথায় দিয়েই হার চুরি করতে গিয়েছিল চোরটা। কিন্তু পরচুলার কোনখানে কোন রকম ফোকর দেখতে পেল না, যেটাকে টাক বলে মনে হয়। কিংবা কৃত্রিম টাকও বানানো নেই কোথাও। ঘন কালো চুলে ঢাকা পরচুলা।

'আমার পরচুলার ব্যাপারে খুব আগ্রহ মনে হচ্ছে তোমাদের?' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'তোমরা বোধহয় জানো না, দড়াবাজিকরদের টাকমাথা হওয়া চলে না। দৈহিক যে কোন খুঁত দর্শকের কাছে যেন রীতিমত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সার্কাসের সব খেলোয়াড়কেই দেখা যেতে হবে যতটা সম্ভব অল্পবয়েসী, চকচকে। নইলে কেন যেন মেনে নিতে চায় না দর্শক। খুশি হয় না। হ্যাঁ, তোমাদের অটোগ্রাফ নেবে না?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি কাগজ আর কলম বের করে দিল কিশোর।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে কাছে এসে দাঁড়াল এ সময় ভালুকছানাটা।

'ইস্, কি সুন্দর!' চিৎকার করে উঠল ফারিহা। 'আমদের কাছেই এসেছে, তাই না? এই, আয়, আয়!'

সত্যি সত্যি ফারিহার কাছে চলে এল ছানাটা। তার পায়ে গা ঘষতে শুরু করল। নিচু হয়ে ওটাকে তুলে নিতে গেল সে। বেজায় ভারী। আকার দেখে অতটা মনে হয় না। গোমড়ামুখো একটা যুবক ছুটতে ছুটতে এল ওটার পেছনে। রুক্ষ ভঙ্গিতে রোমশ ঘাড়টা চেপে ধরল।

'অ্যাই, শয়তান কোথাকার!' ঘাড় ধরে এমন করে ঝাঁকাতে শুরু করল ছানাটাকে, কুঁই কুঁই করে উঠল বেচারা।

'আহা, এমন করে মারছেন কেন?' প্রতিবাদ জানাল ফারিহা। 'এত সুন্দর ছানা। আমাদেরকে দেখতে এসেছিল। অপরাধ তো কিছু করেনি।'

লোকটার গায়ে ঢোলা গেঞ্জী। পরনে একটা ময়লা ফ্লানেলের ট্রাউজার। মাথায় খয়েরী কাপড়ের ক্যাপ।

ছানাটাকে নিয়ে চলে গেল লোকটা। কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এ-ও কি সার্কাসে কাজ করে নাকি? কই, রিঙে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'কেন, রন-পাওলাদের একজন,' গভীর মনোযোগে একের পর এক সই দিয়ে চলেছে দড়াবাজিকর। মনে হয় না ওর অটোগ্রাফ কেউ নিতে আসে। সে-জন্যে খুশি হয়েই দিচ্ছে। 'ওর নাম ডুরেক। জানোয়ারগুলোকে দেখাশোনা করাটা তার বাড়তি কাজ। এসো না কোন এক সময়, ভালুকের খাঁচার কাছে নিয়ে যাব। ভালুকগুলো খাঁচার মধ্যে কি করে দেখতে পারবে। বুড়ো হাতিটাও দু'একটা বাড়তি বনরুটি পেলে খুশি হবে। সঙ্গে করে নিয়ে এসো, নিজের হাতেই খাওয়াতে পারবে। অত বড় শরীর হলে কি হবে, খুবই ভদ্র।'

'সত্যি দেখাবেন?' ভালুকছানাটার কথা মনে করে কোন কিছু না ভেবেই বলে বসল ফারিহা, 'আসব। কালই চলে আসি, কি বলেন?'

'আসো। কাল সকালে,' দড়াবাজিকর বলল। 'এসে আমার খোঁজ কোরো, আমি আশেপাশেই থাকব। আমার নাম রইস।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ যখন আর ধারে কাছে রইল না শোনার মত, ফারিহা বলল, 'ওই লোকটা চোর না হওয়াতে বরং খুশিই হয়েছি আমি। তবে পরচুলাটা যখন খুলে নিয়েছিল, চমকে গিয়েছিলাম।'

'আমিও,' কিশোর বলল। 'গাধা মনে হয়েছিল নিজেকে। রইসকে দেখে মনে হয়েছিল ঝোপের মধ্যে এই মুখই বুঝি দেখেছি। কিন্তু পরে যখন পরচুলাটা খুলে ফেলল, রীতিমত বোকা হয়ে গেলাম। ঝোপের মধ্যে যাকে দেখেছি রইসের চেয়ে তার বয়েসও অনেক কম।'

'চেহারার সূত্র দিয়ে আসলে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বোঝা যাচ্ছে,' রবিন বলল। 'তারচেয়ে ওর পোশাকের দিকেই বরং নজর দেয়া যাক। নীল পুলওভার, লাল সুতোর মিশ্রণ।'

'এটাও তেমন কোন সূত্র না,' অনিতা বলল। 'কত লোকেরই ওই রঙের পুলওভার আছে। ক'জনকে সন্দেহ করব?'

'তুমি কোন বুদ্ধি দিতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

পারল না অনিতা। কেউই পারল না।

'তারমানে গেলাম আটকে আবার,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রহস্যটা অদ্ভুত। একবার মনে হয়, সমাধান হয়ে গেল বুঝি। পরক্ষণে দেখি, হয়নি। আগের জায়গাতেই রয়ে গেছি।'

'সার্কাসের মাঠে যাবে নাকি আবার কালকে,' অনিতা জিজ্ঞেস করল। 'চোরটাকে ধরতে অবশ্যই নয়। কারণ জেনেই তো গেলাম, সার্কাসের দড়াবাজিকর হারটা চুরি করেনি। যেতে চাই আসলে জানোয়ারগুলোকে দেখতে।'

'ঠিক,' ফারিহা বলল। 'ওই ভালুকের বাচ্চাটাকে দারুণ ভাল লাগে আমার। বুড়ো হাতিটাকেও আরও কাছে থেকে দেখব।'

'আমি যাব না,' মানা করে দিল ডলি। 'হাতি আমার ভীষণ ভয় লাগে। অত্তবড় জীব!'

'আমারও অসুবিধে আছে,' রবিন বলল। 'বব, তুমি কি করবে? যাবে? কাল না আমাদের স্ট্যাম্প জোগাড় করতে যাওয়ার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, তাই যাব,' বব বলল। 'অকারণে আর সার্কাসের মাঠে গিয়ে লাভ কি? যা দেখার তো দেখেই এসেছি। ভালুক আর হাতির সঙ্গে খাতির জমানোর এক বিন্দু ইচ্ছে আমার নেই।'

'তাহলে আমরাই যাব,' কিশোর বলল। 'আমি, ফারিহা, মুসা আর অনিতা। তোমরা যে যেখানেই যাও, নীল পুলওভারের দিকে নজর রাখবে। চোখ খোলা রাখলে কখন যে কি চোখে পড়ে যাবে বলা যায় না।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। তখনও জানে না সে, আগামী দিন কি জিনিস আবিষ্কার করতে যাচ্ছে অনিতা।

এগারো

পরদিন সকালে সার্কাসের মাঠে দেখা হলো কিশোর, মুসা, ফারিহা আর অনিতার। টিটুকে সঙ্গে নেয়নি। কারণ গাছের মত মোটা গোড়ালির চারপাশে ছোট্ট কুকুরটাকে শুঁকতে শুঁকতে ঘুরঘুর করতে দেখলে নিশ্চয় পছন্দ করবে না বিশাল হাতিটা।

ফেলে রেখে আসাতে ভীষণ রেগে গেছে টিটু। বাড়ির বাইরে এসেও ওর খেউ খেউ কানে এসেছে কিশোরের।

ফারিহাকে সে-কথা বলতে সে বলল, 'বেচারা টিটু! নিয়ে এলেই ভাল হত। কিন্তু অনেক জানোয়ারই তাকে পছন্দ করবে না। ভালুক, সিংহ, কেউ না। বেশি খুঁতখুঁতে তো, বোধহয় সে-কারণেই অন্য জানোয়ারেরা দেখতে পারে না ওকে।'

সার্কাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সার্কাসের লোকজনকে। সাধারণ পোশাকে পুরোপুরি অন্য রকম লাগছে ওদের। রিঙের মধ্যে যতটা লাগে, এখন অতটা ভাল লাগছে না।

মাঠের মধ্যে আগুন জ্বেলে কালো হয়ে যাওয়া পাত্রের মধ্যে রাঁধছে কেউ কেউ। বাতাসে ভেসে আসছে সুগন্ধ। নাক কুঁচকে বাতাস টানল মুসা। খিদে পেয়ে গেল তার।

রইসকে দেখতে পেল ওরা। কথা রেখেছে দড়াবাজিকর। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। হাতিটার সঙ্গে ওদের খাতির করিয়ে দিল সে। মৃদু হাঁক ছেড়ে ওদের স্বাগত জানাল ওটা। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ফারিহাকে তুলে বসিয়ে দিল তার বিশাল মাথাটায়। চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল ফারিহা।

এরপর ছোট্ট ভালুকটার খোঁজে চলল ওরা। ওদের দেখে ওটাও খুশি হলো। খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে থাবা বাড়িয়ে ওদের হাত ছোঁয়ার চেষ্টা করল। খাঁচার তালা খুলে ওকে বের করে আনল রইস। তার পা আঁকড়ে ধরে পাশ দিয়ে মুখ বের করে কুঁতকুঁতে চোখে তাকাল ওদের দিকে। রীতিমত একটা খুদে ভাঁড়।

'ইস্, ভারীটা যদি আরেকটু কম হত,' আফসোস করতে লাগল ফারিহা। ছানাটাকে তুলে কোলে নিতে ইচ্ছে করছে তার। 'যদি কিনতে পারতাম!'

'তাহলে আর টিটুকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যেত না,' কিশোর

বলল। 'মুখোমুখি হলেই ঝগড়া বাধাত দুটোতে।'

এরপর ওদেরকে সিংহের খাঁচার কাছে নিয়ে গেল রইস। গোমড়ামুখো সেই যুবককে দেখা গেল খাঁচা পরিষ্কার করছে। সঙ্গে আরেকজন লোক। সিংহের ট্রেনার। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। গরগর করে উঠল একটা সিংহ।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ফারিহা।

'ভয় নেই,' ট্রেনার বলল। 'পেটে যতক্ষণ খাবার আছে, মেজাজ ভালই থাকে। তবে বেশি কাছে যেও না। সিংহ বলে কথা। বলা যায় না । ডুরেক, পানিটা বদলে দাও তো। ময়লা হয়ে গেছে।'

চারকোনা একটা বড় টিনের গামলায় সিংহের খাবার পানি দেয়া হয়। বদলে দিল ডুরেক। সামান্যতম ভয় পাচ্ছে না সিংহগুলোকে। কেয়ারই করছে না। গোমড়ামুখো বলে লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না ফারিহার, তবে সে যে দুঃসাহসী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাতে যেমন তাঁবু থেকে বেরোতে ইচ্ছে করেনি, এখন তেমন সার্কাসের মাঠ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না ওদের। কিন্তু কতক্ষণ আর। রইসকে গুড-বাই জানিয়ে ফিরে চলল। যাওয়ার আগে ভালুকছানাটাকে আরেকবার চাপড়ে দিয়ে আদর করল ফারিহা। মাঠের ওপর দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে বিশাল হাতিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ওর মোটা পা চাপড়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। ক্যারাভানগুলোর পাশ দিয়ে এগোল গেটের দিকে।

কাজে ব্যস্ত ক্যারাভানের বাসিন্দারা। ময়লা কাপড় ধুচ্ছে কেউ কেউ। কিছু কাপড় ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে শুকানোর জন্যে। কিছু ঝুলিয়ে দিচ্ছে খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে। বাতাসে উড়ছে সেগুলো। বাতাস বেশি বলে উড়ে যাওয়ার ভয়ে ক্লিপ লাগিয়ে দিতে হচ্ছে।

অলস ভঙ্গিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল গোয়েন্দারা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল অনিতা। দড়িতে ঝোলানো একটা জিনিসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'অমন লাল হয়ে যাচ্ছ কেন? কি হয়েছে?'

'আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই তো কেউ?' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল সে। 'দড়িতে ঝোলানো ওই মোজাগুলো দেখছ?'

সবাই তাকাল দড়িটার দিকে। ছেঁড়া রুমাল, বাচ্চাদের ফ্রক, নানা রকম মোজা শুকাতে দেয়া হয়েছে। নীল পুলওভারটা খুঁজতে লাগল কিশোরের চোখ।

কিন্তু বাতাসে উড়তে দেখল না কোন পুলওভার। কিসের ওপর নজর পড়েছে অনিতার? দৃষ্টি সরাতেই বুঝে গেল কি দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অনিতা।

নীল উলের একজোড়া মোজার দিকে তাকিয়ে আছে সে। প্রতিটি সুতোয় একগাছি করে লাল সুতো মেশানো। দেয়ালে আটকে থাকা উলের সুতোটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। মিল আছে।

নোটবুক থেকে সুতোটা বের করে এনে মোজার সুতোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। নীল রঙটা অবিকল এক। লালটাও এক। উলটাও একই ধরনের।

'আর এই যে দেখো,' ফিসফিস করে বলল অনিতা, 'কেমন কুঁচকে রয়েছে। টান লেগে সুতো ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়ে যায়। সুতো যে ছেঁড়া বোঝাই যাচ্ছে। তারমানে তোমার হাতের সুতোটা এ মোজাটা থেকেই ছিঁড়েছিল।'

কিশোরও একমত হলো।

এক বুড়ি মহিলা এসে খেই খেই করে উঠল, 'অ্যাই অ্যাই, মোজায় হাত দিচ্ছ কেন? চুরি করার ইচ্ছে নাকি?'

ভয়ানক বুড়ি! মোজাটা কার, তাকে জিজ্ঞেস করার সাহসই হলো না কিশোরের। করলে হয়তো ওই মুহূর্তেই জেনে নেয়া যেত, চোরটা কে।

বারো

অনিতাকে ধাক্কা মারল বুড়ি। 'অ্যাই, কথা কানে যাচ্ছে না? সরো! যাও এখান থেকে!'

আর দেরি করল না ওরা। তাড়াতাড়ি সরে এল ওখান থেকে।

'বাপরে বাপ! ডাইনী!' মুসা বলে উঠল।

'ইস্, ফগ থাকলে এখন ভাল হত,' অনিতা বলল। 'বুড়ির সাথে টক্করটা কি রকম লাগে দেখা যেত।'

মাঠে থাকতে মোজাটার কথা তুলল না কেউ। কে কোনখান থেকে শুনে ফেলে এই ভয়ে। কিন্তু মাঠের বাইরে এসেই একসঙ্গে ফেটে পড়ল যেন সবাই।

'মোজার কথা কল্পনাই করিনি আমরা! আমরা তো ছিলাম পুলওভারের খোঁজে!'

'কিন্তু ওই মোজাটা থেকেই যে দেয়ালে সুতো ছিঁড়ে আটকে ছিল তাতে কোন

সন্দেহ নেই!'

'মোজাটা কার যদি জানা যেত! কার জিনিস জানা গেলে ধরে ফেলতে পারতাম চোরটাকে। আচ্ছা, কি হত বুড়িটাকে জিজ্ঞেস করলে? খেয়ে তো আর ফেলত না!'

'খেয়েই ফেলত! যা বুড়ির বুড়ি!'

প্রায় ছুটতে ছুটতে কিশোরদের ছাউনিতে এসে ঢুকল ওরা। এরপর কি করা যায় আলোচনা করার জন্যে। সেখানে বসে থাকতে দেখল রবিন, ডলি আর ববকে। কিশোররা কি করেছে সেটা শোনার অপেক্ষা করল না, নিজেরা কি করেছে বলা শুরু করল।

'কতগুলো গোল গোল দাগ দেখেছিলাম না ওরিয়ন ফোর্টের দেয়ালের কাছে?' বলে উঠল রবিন। 'ওই জিনিস দেখে এসেছি আবার!'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পুরানো চিমনি কটেজটার কাছের নরম মাটিতে,' রবিন জানাল। 'আমি আর বব দেখলাম। দেখেই ছুটলাম ডলিকে জানাতে। তারপর তাকে নিয়ে এখানে এলাম তোমাদের বলতে। কিসের দাগ, বের করে ফেলেছে ডলি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কল্পনাই করতে পারবে না,' ডলি বলল।

'কিসের দাগ? জলদি বলো!' মোজার কথা ভুলেই গেল ফারিহা।

'গোল গোল দাগগুলো দেখে প্রথমে বুঝতে পারিনি কিসের, ওই সেদিনকার মত,' ডলি বলল। 'তারপর কটেজে কে বাস করে মনে পড়তেই বুঝে ফেললাম সব।'

'কে বাস করে?' জানার জন্যে তর সইছে না কিশোরের।

'কেন, জানো না? অ, তুমি তো এখানে থাকো না, না জানারই কথা। ওখানে থাকে খোঁড়া রোজার। একটা পা হাঙরে কামড়ে কেটে ফেলেছিল। ওটাতে কাঠের পা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথায় গোল লোহার রিঙ পরানো। ওটার সাহায্যে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে রোজার।'

সবারই মনে হলো, তাই তো! ঠিকই বলছে ডলি।

কিন্তু কিশোর মেনে নিতে পারল না। মাথা নাড়ল। 'উঁহু, খোঁড়া রোজার হওয়ার সম্ভাবনা কম। এক পা নিয়ে এত উঁচু দেয়াল সে টপকাতে পারবে না। তা ছাড়া চোরটা এক জোড়া মোজা পরে, তারমানে তার দুটো পা।'

'কি করে জানলে ও মোজা পরে?' হাঁ হয়ে গেল ডলি।

সার্কাসে গিয়ে কি জিনিস আবিষ্কার করে এসেছে, জানানো হলো ডলি, বব আর রবিনকে।

নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল ডলি। 'বেশ, মেনে নিলাম খোঁড়া রোজার দেয়াল টপকাতে পারবে না। কিন্তু আসল চোরটাকে চুরি করতে সাহায্যও করতে পারবে না, তা তো নয়। দাগগুলো অবিকল এক। তারমানে দেয়ালের কাছে গিয়েছিল খোঁড়া রোজারই। ও ওখানে কি করছিল?'

ডলির কথায় যুক্তি আছে বুঝে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সেটাই এখন বের করতে হবে আমাদের। ওকে গিয়ে দাগগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা দরকার।...নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে খালি কেসটা। কে ভাবতে পেরেছিল এক পাওয়ালা একটা খোঁড়া লোক গিয়েছিল দেয়ালের কাছে!'

তখনই চিমনি কটেজে রওনা হলো ওরা। বাড়িটার সামনে বেশ খানিকটা জায়গায় নরম মাটি। তাতে গোল দাগের ছড়াছড়ি। ঝুঁকে বসে ভাল করে দেখতে লাগল কিশোর।

নোটবুক থেকে সুতোর টুকরোটা বের করে নিল, গোল দাগের মাপ নিয়েছিল যেটা দিয়ে। মেপে দেখে অবাক হয়ে মুখ তুলল, 'উঁহু, মাপে মিলছে না। এক দাগ নয়। এগুলো ইঞ্চিখানেক ছোট।'

'আশ্চর্য!' বব বলল। 'খোঁড়া রোজার ছাড়াও তাহলে কাঠের পাওয়ালা আরও একজন লোক আছে এই এলাকায়!'

সবাই ভাবতে লাগল। কিন্তু কাঠের পাওয়ালা দ্বিতীয় কোন মানুষের কথা মনে করতে পারল না।

'এখানে তো কিছু হলো না, আবার সেই সার্কাসের দিকেই নজর দিতে হচ্ছে,' কিশোর বলল অবশেষে। 'সেখানে অন্তত জোরাল একটা সূত্র রয়েছে। মোজাগুলোর মালিককে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই পাওয়া যাবে চোরের সন্ধান।'

'কি করে বের করবে?' মুসার প্রশ্ন। 'বুড়িকে জিজ্ঞেস করবে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'করলেও জবাব দেবে না বুড়ি। আবার দূর দূর করে খেদাবে। নজর রাখব আমরা। মোজাগুলো কে পায়ে দেয় দেখব।'

'যদিও কঠিন হবে কাজটা,' রবিন বলল, 'তবে আমারও মনে হয় এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'ঠিক আছে তাহলে,' কিশোর বলল। 'কাল সকাল ঠিক দশটায় চলে এসো সবাই সার্কাসের মাঠে।'

তেরো

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সার্কাসের মাঠে হাজির হয়ে গেল সবাই। আবার দড়াবাজিকর রইসের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল ওরা। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

'শহরে চলে গেছে,' জানাল আরেকজন দড়াবাজিকর। 'তাকে কি দরকার তোমাদের?'

'না, এমনি,' জবাব দিল কিশোর। 'তাকে জিজ্ঞেস করতাম···মানে, অনুমতি নিতাম আরকি তার কাছ থেকে–সার্কাসে ঘুরে বেড়াতে পারব কিনা আমরা। জন্তু-জানোয়ারগুলোর প্রতি আমাদের খুব আগ্রহ।'

'দেখোগে, অসুবিধে নেই,' রইসের হয়ে অনুমতি দিয়ে দিল লোকটা। এগিয়ে গেল তার ক্যারাভানের দিকে। মজার ব্যাপার হলো, পায়ে হেঁটে নয়, চার হাত-পায়ের সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে গেল সে পুরোটা পথ।

'এ ভাবে ঘোরে কি করে ওরা?' অনিতা বলল। 'ঠিক যেন একটা চাকা!'

'দেখো না চেষ্টা করে, পারো নাকি,' হেসে বলল বব।

সত্যিই করে দেখতে গেল অনিতা। কিন্তু হাতের ওপর ভর রাখার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল কুঁকড়ে-বুকড়ে। ঘাসের ওপর পড়ে রইল হাত-পা ছড়িয়ে।

হাসতে লাগল সবাই।

এগিয়ে এল একটা ছোট্ট মেয়ে, ফারিহার সমবয়েসী হবে। অনিতার অবস্থা দেখে হাসল। হাত-পা ছড়িয়ে চাকার মত ঘুরতে শুরু করল মাঠের ওপর। যেন কিছুই না ব্যাপারটা।

'কাণ্ড দেখলে!' বব বলল। 'সার্কাসের একটা ছোট্ট মেয়েও পারে। নিশ্চয় এ সব ওদের হোমওঅর্ক।'

এরপর ভালুকছানাটাকে দেখতে গেল ওরা। কিন্তু ঘুমিয়ে আছে ওটা। সাবধানে এগোল তখন কাপড় রোদে দেয়ার দড়িগুলোর দিকে। মোজাগুলো নেই আজ। যার জিনিস সে হয়তো পরে আছে এখন।

তার সন্ধানে সারা মাঠে ঘুরতে লাগল গোয়েন্দারা। লোকের গোড়ালির দিকে নজর। কিন্তু বড়ই হতাশ হতে হলো, যখন দেখল সবার পা-ই খালি, কারও পায়ে

মোজা নেই।

সিংহের খাঁচার কাছে গিয়ে দরজার তালা খুলতে দেখা গেল ডুরেককে। ভেতরে গিয়ে ধোয়াধুয়ি শুরু করল। সিংহগুলোর দিকে তাকালও না। সিংহগুলোও নজর দিল না ওর দিকে। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার বলে মনে হলো ফারিহার কাছে। সিংহের খাবার কাছে অনবরত ঘোরাঘুরি করছে, অথচ ওকে কিছু বলছে না ওরা।

ফ্লানেলের ট্রাউজারটা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে দিয়েছে সে। নোংরা, ময়লা পা। মোজা নেই। আছে কেবল এক জোড়া রবারের পাম্প শু। মাথার ক্যাপের সামনের দিকটা কপালের ওপর টেনে বসিয়ে দিয়েছে, যাতে খুলে না পড়ে।

খানিকক্ষণ ওর কাজকর্ম দেখে যাওয়ার জন্যে ঘুরল ছেলেমেয়েরা। আর একজন লোককে আসতে দেখল এদিকে। তার গোড়ালির দিকেও তাকাল ওরা। মোজা নেই। সার্কাসের বাকি সবার মত এর পা-ও খালি।

তবে একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে।

ভ্রূকুটি করল লোকটা। 'কি দেখছ?' বিব্রত বোধ করছে সে। 'এ ভাবে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে?'

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রবিন। বন্ধুদের দিকে তাকাল। উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে মুখ। কিশোরের হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল খানিকটা। সবাই এল ওদের সঙ্গে।

সরে এসে, লোকটা যাতে শুনতে না পায় এমন করে বলল সে, 'ওর কোটটা দেখেছ? গাছের ওপর যে ক্যাপটা পেয়েছি, কাপড়টা ঠিক সেটার মত না? তবে ওটার মত ময়লা নয়। নাকি?'

সাত জোড়া চোখ ঘুরে গেল লোকটার দিকে। সিংহের খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে শিকগুলোতে রঙ করতে শুরু করেছে লোকটা। সব সময় সুন্দর আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয় জন্তু-জানোয়ারের খাঁচাগুলো। কোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখেছে খাঁচার কোনায়। কাছে গিয়ে ক্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল গোয়েন্দারা।

'ক্যাপটা আছে তোমার সঙ্গে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল অনিতা।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের কোটের পকেট চাপড়াল কিশোর। তদন্ত করতে এসেছে। সমস্ত সূত্রই নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

হঠাৎ করেই এসে গেল সুযোগ। কে যেন চিৎকার করে ডাকতে লাগল।

সাড়া দিয়ে কথা বলতে চলে গেল লোকটা। খাঁচার কাছে ফেলে গেল তার রঙের ব্রাশ, টিন আর কোটটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে কোটের কাছে ছুটল ওরা।

'সিংহ দেখার ভান করতে থাকো,' নিচুস্বরে সবাইকে বলল কিশোর।

খাঁচার দিকে তাকিয়ে সিংহগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল সবাই, সে পকেট থেকে ক্যাপটা বের করে কোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেল।

কোটের গায়ে চেপে ধরল ক্যাপটা। অবিকল এক। নিশ্চয় একই দর্জির কাছ থেকে একই কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে দুটো জিনিস। এর মানে কি? এই লোকটাই চোর? কিন্তু ক্যাপ ফেলে এল কেন গাছের ডালে? মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না কিশোর।

শিস দিতে দিতে ফিরে এল লোকটা। ব্রাশ তুলে নিয়ে আবার রঙ করতে শুরু করল। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে লোকটার চাঁদিটা দেখার চেষ্টা করল মুসা।

আর কিছু দেখার নেই। খাঁচার কাছ থেকে সরে এল ওরা। লোকটা যাতে শুনতে না পায় এতটা দূরে সরে এসে কিশোর জানাল, 'হ্যাঁ, ক্যাপের সঙ্গে কোটের মিল আছে। এ লোকটা সন্দেহজনক। নজর রাখা দরকার।'

'কোন লাভ নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'ওর চাঁদি দেখে এলাম। চুল কালো ঠিকই, কিন্তু টাক নেই। আমার সঙ্গে গাছে বসে থাকা লোকটা ও নয়। চোর নয় ও।'

চোদ্দ

সার্কাসের মাঠ ঘিরে যে লোহার রেলিঙের বেড়া রয়েছে, তার মাথায় চড়ে বসল গোয়েন্দারা।

কিশোর বাদে বাকি সবাই হতাশ।

'ভাবো দেখি অবস্থাটা,' রবিন বলল। 'ক্যাপের সঙ্গে মিল আছে লোকটার কোটের। কিন্তু চাঁদিতে টাক নেই।' গুঙিয়ে উঠল সে। 'অদ্ভুত এক রহস্য নিয়ে পড়েছি আমরা। নানা ধরনের সূত্র পাচ্ছি, যেগুলো অনেক ভাবেই মিলছে, অথচ সামান্যতম এগোতে পারছি না আমরা।'

'এখন তো মনে হচ্ছে,' তার সঙ্গে সুর মেলাল ফারিহা, 'মোজা পায়ে পরা

কোন লোককে খুঁজে পেলেও দেখা যাবে সে চোর নয়। হয়তো চোরের ভাই, কিংবা খালা কিংবা অন্য কিছু।'

হেসে উঠল সবাই। তবে তিক্ত হাসি।

কিশোর বলল, 'যাই হোক, আমরা এখনও শিওর না, ক্যাপটার সঙ্গে চোরের আসলেই কোন সম্পর্ক আছে কিনা। চুরিটা যেখানে হয়েছে, তার কাছাকাছি পেয়েছি বলেই সন্দেহটা হচ্ছে।'

'যা-ই বলো,' বব বলল, 'আমার বিশ্বাস ক্যাপের সঙ্গে চোরের সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। নইলে ওটা ওখানে যাবে কেন?'

'সেই কেনটা জানতে পারলে অনেক প্রশ্নের জবাবই পেয়ে যেতাম।'

রেলিঙের ওপর বসে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাঠটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সবারই মনে হচ্ছে, রহস্যটা মাথা গুলিয়ে দেয়ার মত। হঠাৎ করেই ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ফারিহার মুখ থেকে।

'কি ব্যাপার? কি হলো? কোন কিছু মনে পড়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি,' হাত তুলে ডানে দেখাল ফারিহা। সবাই ফিরে তাকাল। ফারিহার মত চিৎকার বেরিয়ে এল কারও কারও মুখ থেকে। হাঁ হয়ে গেছে সবাই।

মাঠের ওইখানটা ভেজা ভেজা। নরম মাটিতে দেখা গেল রহস্যময় সেই গোল গোল দাগ। খোঁড়া রোজারের বাড়ির কাছে যে রকম দাগ দেখেছে, সে-রকম।

'এগুলোই মনে হচ্ছে ঠিক সাইজ,' বলে লাফ দিয়ে নেমে গেল কিশোর। 'খোঁড়া রোজারের দাগগুলোর চেয়ে বড়, দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পকেট থেকে সুতোটা বের করে মাপল। কয়েকটা দাগ মেপে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মুখ তুলে তাকাল। মুখে উজ্জ্বল হাসি।

'হ্যাঁ, মিলে গেছে। দেয়ালের কাছে যে দাগগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো আর এগুলো অবিকল এক।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে সার্কাসেও একজন খোঁড়া লোক আছে? সে চোর হতে পারে না, কারণ এক পা নিয়ে দেয়ালে চড়তে পারবে না। তবে চোরের সাগরেদ হতে পারে।'

'খুঁজে বের করা দরকার ওকে,' বব বলল। 'ওকে বের করে তার বন্ধুটি কে জেনে নিতে পারলেই পেয়ে যাব আমাদের চোরটাকে। এবং আমার বিশ্বাস,

চোরের পায়েই মোজাগুলো দেখতে পাব আমরা। যাক, এগোতে শুরু করেছি এতক্ষণে।'

খানিক দূরে সার্কাসের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে ঘুরঘুর করতে দেখে ডাক দিল কিশোর। 'অ্যাই, শুনে যাও।' সে কাছে এলে বলল, 'সার্কাসের খোঁড়া লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা। কোন ক্যারাভানে থাকে?'

'বোকা নাকি,' মেয়েটা জবাব দিল। 'ল্যাংড়া মানুষ সার্কাসের কোন কাজে আসবে? এখানে যারা আছি আমরা, সবারই দুটো করে পা। হাত-পা সব ঠিক না থাকলে সার্কাসে খেলা দেখানো যায় না।'

'দেখো,' জোর দিয়ে বলল কিশোর, 'আমরা জানি, খোঁড়া একটা লোক আছেই এখানে।' পকেট থেকে একমুঠো লজেন্স বের করে দিল মেয়েটাকে। 'নাও। এবার বলো, লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে লজেন্সগুলো প্রায় কেড়ে নিল মেয়েটা। একসঙ্গে মুখে পুরে দিল গোটা তিনেক। চুষতে চুষতে বলল, 'খামোকাই দিলে। তোমরা পাগল। এখানে এক পাওয়ালা কোন লোক থাকে না।'

আর কোন প্রশ্ন করার আগেই সেখান থেকে চলে গেল মেয়েটা। বাকি লজেন্সগুলো পকেটে রেখে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চাকার মত ঘুরে ঘুরে। এ ভাবে চললে হাঁটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি চলা যায়।

'গিয়ে যদি ধরে চাবকাওও এখন ওকে,' কাছের একটা ক্যারাভান থেকে বলে উঠল এক মহিলা, 'তাহলেও কোন লাভ নেই। খোঁড়া লোকের খোঁজ দিতে পারবে না ও। কারণ এ সার্কাসে কোন খোঁড়া লোক নেই।'

ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা।

হাবা হয়ে গেল আবার গোয়েন্দারা।

'কপালটাই খারাপ আমাদের! সে-জন্যেই এগোতে এগোতেও এগোতে পারছি না,' রবিন বলল। 'চিমনি কটেজের কাছে গিয়ে গোল দাগ দেখে ভাবলাম চোর ওখানে থাকে। মাপে মিলল না। এখানে দাগগুলো মাপে মিলল। কিন্তু খোঁড়া কোন লোকই থাকে না। আর কত অবাক হব!'

'অত হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'দাগগুলো অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।'

নরম মাটিতে দাগ স্পষ্ট। মাটি যেখানে শক্ত, সেখানে দাগ অতটা না বসলেও ঘাসের গায়ে যেটুকু বসেছে সেটা দেখেই অনুসরণ করা গেল। দাগগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে সিংহের খাঁচার কাছ থেকে সামান্য দূরে রাখা ছোট একটা

ক্যারাভানের কাছে। পাশের আরেকটা ক্যারাভানের সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখা গেল ডুরেককে। ওদের এ ভাবে এগোতে দেখে অবাক হলো সে।

দাগ শেষ হয়েছে যেটার কাছে, সে-ক্যারাভানটার সিঁড়িতে উঠে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। সার্কাসের মালপত্রে বোঝাই। কেউ থাকে বলে মনে হলো না।

ঠক করে ওদের কাছে এসে পড়ল একটা ইঁটের টুকরো। আরেকটা এসে লাগল ববের পায়ে। চিৎকার করে উঠল ডুরেক, 'ওখানে উঁকি মারছ কেন? চুরি করার ইচ্ছে?' হাত বাড়িয়ে আরেকটা ইঁটের টুকরো তুলে নিল সে। 'যাও এখান থেকে জলদি! নইলে মাথায় মারব বলে দিলাম!'

পনেরো

ওখান থেকে দ্রুত সরে এল ওরা। মাঠেই থাকল না আর। রাস্তায় বেরিয়ে এল। গোড়ালি ডলতে লাগল বব। যেখানে ঢিলটা লেগেছে ব্যথা করছে।

'জানোয়ার কোথাকার!' গজগজ করতে লাগল সে। 'দেখতে দিল না কেন আমাদের? কি লুকিয়ে রেখেছে?'

'নিশ্চয় চোরাই মাল,' হেসে রসিকতা করল ফারিহা। 'মুক্তার হার।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। হাসির ব্যাপার নয়। মুক্তোটা এই সার্কাসেরই কোনখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নইলে এত রেগে উঠল কেন ডুরেক?'

'ক্যারাভানটায় ঢুকে দেখতে পারলে হত,' মুসা বলল। 'কিন্তু কি ভাবে ঢুকব?'

'ঢুকব!' কিশোর বলল। 'রাতে আসব আবার। সার্কাস যখন চলে। সবাই থাকবে সার্কাসের তাঁবুতে ব্যস্ত। এই সুযোগে ঢুকে পড়ব আমরা।'

'কিন্তু এ রকম একটা জায়গায় এত দামী একটা জিনিস রাখবে?' সন্দেহ হচ্ছে অনিতার।

'চোরাই মাল যখন, যেখানে খুশি রাখতে পারে, কারও চোখে না পড়লেই হলো,' জবাব দিল কিশোর। 'গোল দাগগুলো ওই ক্যারাভানটার কাছেই গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই ওটাতেই আগে খোঁজা দরকার।'

'তা ঠিক,' একমত হলো ডলি। 'খোঁড়া লোকটার কেঠো পায়ের দাগ, যে

লোকটাকে দেখিইনি আমরা কখনও। তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'আরেকটা রহস্য,' বব বলল। 'তবে দাগ যখন পাওয়া গেছে তাকেও পাওয়া যাবে। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা জটিল ধাঁধার মত লাগছে আমার কাছে। তবে আমি জানি, খাপে খাপে যখন বসে যাবে, পানির মত সহজ হয়ে যাবে সব কিছু।'

'জানলে তো পানির মতই সহজ হয়,' অনিতা বলল, 'কিন্তু বুঝতেই তো পারছি না কি করে বসাব। দড়ির মধ্যে ঝুলতে দেখলাম এক জোড়া মোজা, ক্যাপের সঙ্গে মিলে যাওয়া একটা কোট। কোটের মালিককে দেখলাম, সার্কাসের মাঠে খুঁজে পেলাম অসংখ্য গোল দাগ। অথচ কোনটাই তো কোনটার সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না।'

'চলো, বাড়ি যাই,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। 'খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সারাটা সকালই তো কাটিয়ে দিলাম এখানে। কিছুই করতে পারলাম না। এ কেসের সমাধান আদৌ করতে পারা যাবে কিনা বুঝতে পারছি না। দাগগুলো অনুসরণ করে এসেও চোরের দেখা পাওয়া গেল না।'

'আজকে আর কোন মীটিং নেই,' রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। 'আজ রাতেও সার্কাসে যাচ্ছি আমরা। তবে শুধু আমি আর মুসা যাব। সবার যাবার দরকার নেই। মুসা, একটা টর্চ নিয়ে আসবে। হারটা ক্যারাভানে থাকলে আলো ছাড়া দেখতে পাব না।'

'তা আনব,' মুসা বলল। 'তবে হার পাওয়ার ব্যাপারে মোটেও আশাবাদী নই আমি।'

রাতে সার্কাসে আগে পৌঁছল মুসা। তার মিনিটখানেক পরে ছুটতে ছুটতে এল কিশোর। দুটো টিকেট কেটে আনল সে। সার্কাসে ঢুকল দু'জনে।

'অর্ধেকটা দেখব,' ফিসফিস করে বলল সে। 'সার্কাস যখন জমে উঠবে, আস্তে করে বেরিয়ে চলে যাব।'

পেছনের একটা সুবিধাজনক জায়গায় এসে বসল ওরা, যাতে সহজে বেরোতে পারে। শো শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

আগের দিনের চেয়েও এদিন খেলাগুলো ভাল লাগছে ওদের কাছে। ভাঁড়েরা এল, দড়াবাজিকরেরা এল, এল রন-পাওয়ালারা। পুরো শো'টা না দেখে বেরোতে হলো বলে দুঃখই লাগল ওদের।

মাঠটা অন্ধকার। কোন্ দিকে যাবে, দিক ঠিক করতে সময় লাগল ওদের।

'ওদিকে,' মুসার হাত ধরে টানল কিশোর। 'মনে হচ্ছে ওই ক্যারাভানটা।'

সাবধানে ক্যারাভানের দিকে এগোল ওরা। টর্চ জ্বালতে সাহস করল না কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ক্যারাভানের কাছে এসে সিঁড়িতে হোঁচট খেল কিশোর। সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'এসো, দাঁড়িয়ে আছ কেন?' ফিসফিস করে মুসাকে বলল সে।

কেউ নেই। দরজায় তালাও নেই। ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

অন্ধকারে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগাল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'টর্চ জ্বালব?'

'জ্বালো। কারও সাড়াশব্দ তো শোনা যাচ্ছে না।' টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে আলো জ্বালল কিশোর। রশ্মিটা সরাসরি বেরোতে দিল না। হাতের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আভা বেরোচ্ছে সেই আলোয় দেখার চেষ্টা করল।

মুখ কুঁচকাল বিরক্তিতে। ভুল ক্যারাভানে ঢুকেছে। মালপত্রে ভরা ছোট ক্যারাভানটা নয়, ঢুকেছে আরও বড় একটা ক্যারাভানে, যেটাতে লোক বাস করে। এখুনি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। ধরা পড়ার আগেই।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাইরে মানুষের গলা শোনা গেল। কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। সিঁড়িতে পা রাখার শব্দ হলো। কি করবে ওরা? কোথায় লুকাবে?

ষোলো

'জলদি! তুমি ওই বাঙ্কটার নিচে গিয়ে ঢোকো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আমি এটাতে ঢুকছি।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'জনে। বিছানার চাদরটা অনেকখানি বেরিয়ে ঝুলে রয়েছে। আড়াল করে রাখবে ওদের।

দু'জন লোক ঢুকল ক্যারাভানে। একজন হ্যারিকেন ধরাল। দুটো বাঙ্কে মুখোমুখি বসল দু'জনে। ওদের পা ছাড়া আর কোন কিছুই নজরে আসছে না কিশোরের।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল সে। ওপাশের বাঙ্কটায় যে লোকটা বসেছে, পা চুলকানোর জন্যে প্যান্টের নিচের দিকটা উঁচু করল সে। তার পায়ে নীল রঙের মোজা। উলগুলোতে এক গাছি করে লাল সুতো মেশানো।

কয়েক হাতের মধ্যেই রয়েছে চোরটা, অথচ মুখ দেখতে পাচ্ছে না! দুর্ভাগ্য

একেই বলে। ভাবছে কিশোর।

'আজ রাতেই কেটে পড়ছি আমি,' একজন বলল। 'সার্কাস মোটেও ভাল্লাগছে না আমার। পচা পচা সব শো। সারাক্ষণ লোকগুলো করে ঝগড়াঝাঁটি। পুলিশের ভয় তো আছেই। কোন্ সময় যে এসে হাজির হবে খোদাই জানে!'

'অকারণে এত ভয় পাচ্ছ তুমি,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মোজা পরা লোকটা। 'পরিস্থিতি আগে খানিকটা ঠাণ্ডাঠুণ্ডা হোক। কবে বের করে দিতে হবে জানিও। যেখানে আছে নিরাপদেই আছে। মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও অসুবিধে হবে না।'

'সত্যি কি হবে না?'

'না, হবে না,' হেসে উঠল মোজা পরা লোকটা। অদ্ভুত একটা কথা বলল, 'সিংহেরাই পাহারা দেবে।'

কান পেতে শুনছে মুসা আর কিশোর। বিস্মিত। ভীত। চোরটা এখানেই আছে—মোজা পরা লোকটা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার চেহারাটা কোনমতেই দেখার উপায় নেই। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, আপাতত হারটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বের করবে। আর দ্বিতীয় লোকটা ভয় পেয়ে চলে যেতে চাইছে।

'তুমি ওদের বোলো,' প্রথম লোকটা বলল, 'হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ আর রিঙে যেতে পারব না আমি। কালকে আমাকে না দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলে, যা হোক বানিয়ে বলে দিও একটা কিছু।' এক মুহূর্ত থামল লোকটা। তারপর বলল, 'তাহলে আমি এখন যাই। সবাই এখন রিঙে। কেটে পড়ার এইই সুযোগ। ঘোড়াটা লাগিয়ে দিয়ে যাবে, প্লীজ?'

মোজা পরা লোকটা উঠে দাঁড়াল। নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। মনে প্রাণে চাইছে মুসা আর কিশোর, অন্য লোকটাও উঠে চলে যাক। তাহলে ওরাও বেরোনোর সুযোগ পাবে। কিন্তু গেল না লোকটা। যেখানে ছিল সেখানে বসেই আঙুল দিয়ে টাট্টু বাজাতে লাগল বিছানার ওপর। বোঝা যাচ্ছে ভয়ের কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে।

ক্যারাভানের জোয়ালের মত জিনিসটায় ঘোড়া জুতার শব্দ হলো। সিঁড়িতে দেখা দিল প্রথম লোকটা। 'নাও, হয়েছে। চলে যাও এখন। পরে দেখা করব।'

বাক্স থেকে উঠে দ্বিতীয় লোকটাও বেরিয়ে গেল। দুই গোয়েন্দাকে চমকে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ঘুরে চলে গেল সামনের দিকে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে টান দিল ঘোড়ার লাগাম

ধরে। মাঠের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা।

বাক্সের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মুসা। মহা বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল। 'ভাল! দরজায় তালা। বেরোব কি করে?'

'বুঝতে পারছি না!' বাক্সের নিচের অস্বস্তিকর জায়গাটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে শুরু করল কিশোরও। 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, একজনের পায়ে নীল মোজা ছিল? ওই লোকটাই চোর।'

'অনেক কিছুই জানা হলো আজ,' জবাব দিল মুসা। সে-ও বেরিয়ে এল হামাগুড়ি দিয়ে। 'এখন আমরা জানি, সার্কাসেরই কোনখানে লুকানো রয়েছে হারটা। সিংহেরাই পাহারা দেবে বলে কি বোঝাতে চাইল লোকটা?'

'সিংহেরা পাহারা দিতে পারবে কোনখানে থাকলে? ওদের খাঁচায়। কিন্তু ওখানে লুকানোর জায়গা কোথায়? লোহার শিক ছাড়া তো আর কিছু নেই। তোমার কি মনে হয় কোন ফাঁপা শিকটিক আছে?'

'উঁহু,' জবাব দিল মুসা। 'কোথায় রেখেছে পরে দেখব। এখন এখান থেকে বেরোনো দরকার। জানালা দিয়ে চেষ্টা করে দেখব নাকি?'

বড় জানালাটা সামনের দিকে। সেটার কাছে এসে উঁকি দিল দু'জনে। বাইরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে। রাস্তার আলোর নিচে চলে এল এ সময় গাড়ি। কনুই দিয়ে মুসার গায়ে গুঁতো মারল কিশোর।

'দেখো দেখো!' ফিসফিস করে বলল সে। 'চিনতে পারছ লোকটাকে? কোট পরা লোকটা, যার কোটের সঙ্গে ক্যাপটা মেলে। সিংহের খাঁচায় রঙ করছিল যে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'একই ক্যারাভানে থাকত তো, আমার মনে হয়, ওর ক্যাপটা ধার নিয়েছিল চোর। গন্ধ সহ্য করতে না পেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে গাছের ডালে। যাক, আরেকটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল।'

জানালার শার্সি খোলার চেষ্টা চালাল কিশোর। খুলতে গিয়ে শব্দ করে ফেলল। ঝট করে পেছনে ফিরে তাকাল লোকটা। রাস্তার আলোয় নিশ্চয় চোখে পড়ে গেল ওদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে লাফিয়ে নেমে এল সীট থেকে। দৌড়ে এল সিঁড়ির দিকে।

'সেরেছে!' বলে উঠল কিশোর। 'দেখে ফেলেছে বোধহয় আমাদের। জলদি, আবার বাক্সের নিচে ঢোকো!'

সতেরো

তালা খোলার শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। শক্তিশালী টর্চ হাতে ভেতরে ঢুকল লোকটা। চারপাশে আলো ফেলে দেখতে শুরু করল।

আবার বাঙ্কের নিচে ঢুকে পড়ায় দুই গোয়েন্দাকে দেখতে পেল না। কিন্তু এবার সে জানে, ভেতরে কেউ আছে। কাজেই সবখানে না দেখে থামবে না। বিছানার চাদরের ঝুল সরাল সে। দেখে ফেলল কিশোরকে।

হাত ধরে টেনে-হিচড়ে বের করে নিয়ে এল ওকে। প্রচণ্ড রাগে কাঁধ ধরে এত জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল, চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুসা বুঝল, লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই। সে-ও বেরিয়ে এল। যদি কোন সাহায্য করা যায় কিশোরকে।

'অ, তাহলে দু'জন!' চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'এখানে কি করছিলে? কতক্ষণ ধরে আছ?'

'বেশিক্ষণ না,' জবাব দিল কিশোর। 'ভুল করে ঢুকে পড়েছি। আরেকটা ক্যারাভানে ঢুকতে চেয়েছিলাম, ঢুকে পড়েছি এটাতে।'

'এ গল্প আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?' আরও রেগে গেল লোকটা। 'চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব! জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব! অন্যের ক্যারাভানে ভুল করেও আর ঢুকতে সাহস পাবে না কোনদিন।'

একটা তাকের ওপর টর্চটা শুইয়ে রাখল সে। সেই আলোয় ক্যারাভানের ভেতরটা প্রায় পুরোটাই চোখে পড়ছে। কোটের হাতা দুটো যতটা পারল ঠেলে তুলে দিল কনুইয়ের কাছে। বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত।

হঠাৎ পা তুলে টর্চটায় এক লাথি মারল মুসা। ঝটকা দিয়ে শূন্যে উঠে শব্দ করে মেঝেতে পরল ওটা। কাঁচ ভাঙল। বাল্ব ভাঙল। নিভে গেল আলো। আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো ক্যারাভান।

লোকটার পেটে গুঁতো মারার জন্যে মাথা নিচু করে ছুটে গেল সে। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চলে গেল দরজার দিকে। তীর গতিতে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। সিঁড়িতে পড়ল প্রথমে। সেখান থেকে ময়দার বস্তার মত ধপাস করে গিয়ে পড়ল নিচের রাস্তায়।

ঠাস করে এক চড় এসে লাগল কিশোরের গালে। রেগে গেল সে। লোকটাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। মাথা নিচু করে পড়ল লোকটার পায়ের কাছে। টান মারল পা ধরে। টলে উঠল লোকটা। সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল। শরীর মুচড়ে মুচড়ে সিঁড়ির দিকে সরে গেল কিশোর। গড়িয়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। তবে মুসার মত ব্যথা পেল না। সেখান থেকে উঠে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে।

এ সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড দেখে ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। ছোটার সময় একবার এপাশে একবার ওপাশে সরে গিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দোল খেতে লাগল ক্যারাভানের পেছনটা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে। ভেতর থেকে শোনা গেল লোকটার ভয়ার্ত চিৎকার।

'মুসা! এই মুসা?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জলদি বেরিয়ে এসো। ঘোড়া সামলে নিয়ে লোকটা ফিরে আসার আগেই পালাই।'

আরেকটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মুসা। রাস্তা ধরে উল্টো দিকে ছুটল দু'জনে পড়িমরি করে।

'এবারকার কেসের প্রতিটি ব্যাপারই খালি ঝামেলা পাকাচ্ছে,' কিছুদূর এগিয়ে গতি কমানোর পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'করতে যাই একটা, হয়ে যায় আরেকটা। সঠিক ক্যারাভানটাতে পর্যন্ত ঢুকতে পারলাম না। ঢুকলাম গিয়ে অন্যটায়।'

'তাতে লোকসান অবশ্য হয়নি,' জবাব দিল কিশোর। 'নিশ্চিত হলাম, নীল মোজাগুলো চোরটারই। চেহারা দেখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি আর করা। গলাটা চেনা চেনা লেগেছে। মনে করতে পারছি না কার।'

'কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'সার্কাসে? না বাড়িতে? এদিকের এই রাস্তাটা শুনেছি ভাল না। ভূত আছে। শেষে রাত দুপুরে পথ ভুলিয়ে না আবার অন্য কোনদিকে নিয়ে চলে যায়।'

ভূতের কথা কানেই তুলল না কিশোর। বলল, 'সার্কাসের মাঠেই ফিরে যাব। মোজাগুলো কার পায়ে দেখতে হবে।'

কিন্তু সার্কাসে ঢুকতে আর ভাল লাগছে না মুসার। বলল, সে গেটের কাছে অপেক্ষা করবে।

বেড়া টপকে আবার মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল কিশোর।

শো শেষ। বাড়ি চলে গেছে দর্শকরা।

এক জায়গায় অনেকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে চলল সেদিকে। রাতের খাবার খেতে বসেছে সার্কাসের লোকেরা। উজ্জ্বল হাসিখুশি আলো ছড়াচ্ছে

যেন অগ্নিকুণ্ড আর লণ্ঠনগুলো।

আলোর কাছাকাছি কতগুলো ছেলেমেয়েকে খেলতে দেখল কিশোর। একজন অস্বাভাবিক লম্বা। কাছে যেতে দেখা গেল সেই মেয়েটা, যাকে চকলেট দিয়েছিল। রন-পায় ভর করে হাঁটছে। এগিয়ে আসতে লাগল। ক্যারাভানের ছায়ায় গা ঢেকে রয়েছে কিশোর। তারপরেও হয়তো তাকে দেখে ফেলত মেয়েটা, কিন্তু তার মনোযোগ নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে, অন্য কোন দিকে নজর দিতে পারছে না তাই।

কিশোরের সামনে দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। মাটির দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল কিশোরের। গোল গোল দাগ পড়েছে রন-পা'র চাপে। ওরিয়ন ফোর্টের দেয়ালের কাছে যেমন দেখেছিল। কাছের একটা লণ্ঠন থেকে এসে পড়া আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দাগগুলো।

'আমি একটা গাধা!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'নইলে অনেক আগেই বুঝে যাওয়া উচিত ছিল এত সহজ ব্যাপারটা!'

আঠারো

মুখ তুলে আবার মেয়েটার দিকে তাকাল সে। যেদিকেই যাচ্ছে, মাটিতে গোল দাগ রেখে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে দাগের কারণ বোঝা গেল। সমাধান হলো আরেকটা রহস্যের।

'চোরটা রন-পা'র খেলা দেখায়,' নিজেকে বলল সে। 'ওগুলো নিয়ে চলে গিয়েছিল ওরিয়ন ফোর্টে। মুসাকে বলা দরকার।'

গেটের দিকে দৌড় দিল সে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

'মুসা, সাংঘাতিক এক আবিষ্কার করে এলাম!' বলল কিশোর। 'গোল গোল দাগগুলো কিসের, দেখে এসেছি। খোঁড়া মানুষের পায়ের দাগ নয়।'

'খাইছে! তাহলে কিসের?'

'রন-পা। মাথাটা গোল, লোহার আংটা পরানো থাকে। ওগুলো পরে খুব সহজেই দেয়ালের মাথার নাগাল পাওয়া সম্ভব। চালাকিটা ভালই করেছিল!'

'কিন্তু কি ভাবে দেয়াল টপকাল?' মাথায় ঢুকছে না মুসার। 'কিশোর, বাড়ি চলো। বহুত ঝামেলা গেছে। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না এখন। খুব ক্লান্ত

লাগছে।'

'আমারও,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, চলো। আজ আর কিছু ভাবব না। কাল সকাল বেলা মীটিঙে আলোচনা করব। ফারিহাকে পাঠিয়ে সবাইকে আসতে খবর দিয়ে দিও।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'রন-পা লাগিয়ে কি ভাবে ভেতরে ঢুকল, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না আমি।'

বোঝার অবস্থা মুসারও নেই। বড় করে হাই তুলল। ক্যারাভান থেকে পড়ে গিয়ে কপালে বাড়ি খেয়েছে। ব্যথা করছে। ঘোলাটে লাগছে মাথার ভেতরটা। বাড়ি গিয়ে সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়ার জন্যে অস্থির।

বাড়ি ফিরল যখন সে, ফারিহা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। ওকে জাগাল না। সোজা চলে এল নিজের ঘরে।

ওদিকে বিছানায় শুয়ে খানিক ভাবার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু সে-ও ক্লান্ত। সারাটা দিন অনেক পরিশ্রম করেছে। ধকল গেছে শরীরের ওপর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে রাতের অভিযানের কথা ফারিহার কাছে চেপে গেল মুসা। মীটিঙে সবার সামনে ফাঁস করা হবে। বলল, জরুরী আলোচনা আছে। সবাইকে খবর দিতে। কিশোরদের বাড়িতে যেতে হবে।

ছাউনিতে ঢুকেই কিশোরকে দেখে প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল অনিতা, 'কি হয়েছিল কাল রাতে? হারটা পেয়েছ? চোরটা কে, জানতে পেরেছ?'

'হারটা কোথায় জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে বাকি সমস্ত রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।'

'তাই নাকি?' শুনে মুসাও অবাক। 'কই, আমি তো জানি না! কখন করলে? আমার মাথার মধ্যেটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। ঝিমঝিম করছে।'

'বলে ফেলো, কিশোর,' বব বলল। 'জলদি! সহ্য করতে পারছি না আর!'

'এখানে কিছু না বলে চলো হেয়ার ফরেস্টে চলে যাই,' কিশোর বলল। 'চোরটা কি করে ঢুকেছিল দেখাব তোমাদের।'

'এখানেই বলে ফেলো না!' অন্যদের মতই অস্থির হয়ে গেছে ফারিহা। তর সইছে না।

'না। ওখানে গিয়েই দেখাব,' নাটকীয়তা খুব পছন্দ কিশোরের।

সুতরাং কি আর করা। দল বেঁধে আবার হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা। ওরিয়ন ফোর্টের গেটের কাছে এসে দেখল, ফুলের বেডে কাজ করছে মালী।

'বিটেল? গেটটা খুলে দেবেন?' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ভেতরে ঢুকব

আমরা। কাজ আছে।'

হাসিমুখে গেট খুলে দিল বিটেল। 'কিছু পেয়েছ নাকি?'

হুড়োহুড়ি করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

'হ্যাঁ, অনেক কিছু,' জবাব দিল কিশোর। 'আসুন আমার সঙ্গে। দেখাচ্ছি।' যেখান দিয়ে দেয়াল টপকেছে চোরটা, সেখানে নিয়ে চলল সবাইকে।

গেটের কাছে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। বিটেল বলল, 'তোমরা এগোও। আমি গেট খুলে দিয়ে আসি।'

দলবল নিয়ে দাগগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'ভালমত দেখো সব, তাহলেই বুঝতে পারবে,' বলল সে। 'রন-পা পরে হাঁটতে পারে লোকটা। রন-পা নিয়ে দেয়ালের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওগুলোতে চড়ে দেয়ালের মাথার নাগাল পেয়েছে। উঠে বসেছিল ওপরে। পা থেকে আবার রন-পা খুলে নিয়ে এ পাশে নামিয়ে দেয়। দেয়াল থেকে নামতেও ওগুলো ব্যবহার করে। রন-পা'য় চড়েই হেঁটে যায় বাড়ির দিকে, তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় বলে। দেয়ালের কাছের নরম মাটিতে দাগ বসে যায় তাতে। কিন্তু বাগানের শক্ত মাটিতে বসতে পারেনি। পাতাবাহারের ঝাড়ের মধ্যে ওগুলো লুকিয়ে রেখে বাড়িতে ঢুকে পড়ে।'

থামল কিশোর।

'থামলে কেন? বলো না!' কিশোরকে দম নিতে দিতেও রাজি নয় ফারিহা।

'বাড়িতে ঢুকে, হারটা চুরি করে, রন-পা নিয়ে চলে যায় আবার দেয়ালের কাছে। মাটিতে রেখে যায় আরও কিছু গোল দাগ।'

'ঠিক বলেছ!' দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল অনিতা।

'আবার দেয়ালে চড়ে,' কিশোর বলল। 'মাথার টুপিটা ডালে আটকে যায়। ওটা খুলে নেয়ার ঝামেলাটুকুও করতে চায়নি। কারণ জিনিসটা বাতিল। তা ছাড়া দুর্গন্ধ। সহ্য করতে পারছিল না বোধহয় সে। তাড়াহুড়োও ছিল। খুলতে গেলে সময় নষ্ট হবে। তাড়াহুড়ার কারণেই মোজাও লেগে যায় ধারাল ইঁটের কোনায়। সুতো ছিঁড়ে রয়ে যায়। ওসবের পরোয়া না করে দেয়ালের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নেমে যায় অন্য পাশে।'

'নিশ্চয় ওই সময়ই আমার চোখে পড়ে সে!' মুসা বলল। 'কিন্তু কিশোর, ওর পায়ে তো তখন রন-পা ছিল না। ওগুলো কি করেছে?'

উনিশ

'কি করেছে, শুনবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অনুমান করতে পারি। দেয়ালের মাথায় চড়ে প্রথমে ঘন ঝোপে ছুঁড়ে ফেলেছিল ওগুলো। তারপর লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেছে। নামার সময়ই কেবল ওকে চোখে পড়েছে তোমার, তার আগে নয়।'

'ঠিক! ঠিক! তা-ই হবে,' অনিতা বলল। 'কিন্তু কোন্ ঝোপটাতে ফেলল?'

দেয়ালের ওপর দিয়ে যে সব গাছপালা আর উঁচু ঝোপ দেখা যাচ্ছে, পিছিয়ে এসে সেগুলোর দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'হলি গাছের ঝাড়!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'যেমন ঘন, তেমনি কাঁটা। পারতপক্ষে কেউ যেতে চায় না হলি ঝাড়ের দিকে। রন-পাগুলো ফেলে কাঁটার ভয়ে চোরটা নিজেও সেগুলো বের করে আনতে যায়নি। পরে এসে যদি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা। মুসা যতক্ষণ গাছের ওপর ছিল ততক্ষণ অন্তত নেয়নি।'

'ঠিক,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এটাই জবাব। চলো, খুঁজে বের করি।'

দল বেঁধে আবার গেটের দিকে ছুটল ওরা। বাইরে বেরিয়ে দেয়াল ঘুরে দৌড়ে এল সেই জায়গাটাতে, যেখান দিয়ে ঢুকেছিল চোরটা।

কাছাকাছি যে হলি ঝাড়টা রয়েছে, সেটার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, ছোটখাট দুয়েকটা ভাঙা ডাল। পাতা মরে শুকিয়ে এসেছে। ভারী কিছুর আঘাতেই ভেঙেছে বোঝা যায়। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। নিচু হয়ে তাকাতেই ভেতরে দেখতে পেল দুটো রন-পা পড়ে আছে। কাঁটার ভয় না করে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। টেনে বের করে আনল রন-পা দুটো।

'দারুণ! দারুণ!' হাততালি দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল ফারিহা। 'সমাধানটা তাহলে করেই ছাড়লে!'

'হার চুরির সমাধান, তাই না?' বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দেখে ওরা, মাত্র দশ গজ দূরে বিটেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন।

'ক্যাপ্টেন!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, এসেছিলাম মিসেস ওরিয়নের সঙ্গে কথা বলতে,' কাছে এসে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বিটেল আমাকে বলল, কেসটার সমাধান নাকি করে ফেলেছ তোমরা। একটু পর তোমাদেরকে গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে। ঘটনাটা কি? পুলিশকে টেক্কা দিলে নাকি আবারও?'

হেসে উঠল কিশোর। 'তা বলতে পারেন। তবে আমরা ছোট বলেই পারলাম। ছেলেমানুষ ভেবে কেউ পাত্তা দেয়নি। সাত সাতজন পুলিশের লোক যদি আমাদের মত গিয়ে সার্কাসে ঘুরঘুর করতে থাকত, চোরটাকে খুঁজে বের করা সহজ হত না। সতর্ক হয়ে যেত সে।'

'তা ঠিক,' নিচু হয়ে একটা রন-পা তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। 'উঁচু দেয়াল টপকানোর চমৎকার বুদ্ধি করেছিল। চোরটা কে, তা-ও নিশ্চয় বলতে পারবে, তাই না?'

'পারব। সার্কাসে রন-পা পরে খেলা দেখায়,' জবাব দিল কিশোর, 'সম্ভবত, ডুরেক। নীল রঙের মোজা পরে সে। মোজার নীল উলের সঙ্গে লাল সুতোর মিশ্রণ রয়েছে।'

'তার মাথায় কালো চুল,' মুসা বলল। 'চাঁদিতে গোল একটা বিশ্রী টাক।'

'বাপরে! এত কিছু জানো!' অবাক না হয়ে পারলেন না ক্যাপ্টেন। 'কোন রঙের পাজামা পরে ঘুমায়, কি খায়, তা-ও নিশ্চয় বলে দিতে পারবে। তা যাবে নাকি একবার সার্কাসে? আমিও যেতাম তাহলে। গাড়িতে দু'জন লোক বসে আছে আমার। ওরাও যাবে।'

তিন-তিনজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে সার্কাসের মাঠে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যটা কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হলো ডলি। 'আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যাবে সার্কাসের লোকেরা, তাই না?'

'তা পাবে কেন? সবাই তো আর চোর নয়।' মুসার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'চলো গিয়ে দেখে আসি লোকটার চাঁদির টাকটা।'

আরেকবার সার্কাসের মাঠে এসে ঢুকল ওরা। গাড়িতে করে আগেই গেটের কাছে এসে বসে ছিল পুলিশ। এক গাড়িতে এতজনের জায়গা হয় না, তাই গোয়েন্দারা হেঁটে এসেছে। ওদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন পুলিশ অফিসার।

'ওই যে, ডুরেক,' একটা ক্যারাভানের কাছে ঝুঁকে থাকা গোমড়ামুখো লোকটাকে দেখাল কিশোর। 'কিন্তু পায়ে তো মোজা নেই।'

'তাতে কি?' মুসা বলল। 'ওর টাক আছে কিনা দেখব। পুলিশ বললে ক্যাপ

খুলতে আর মানা করতে পারবে না।'

কাজ করছে ডুরেক। ওরা কাছে আসতে মুখ তুলে তাকাল। পুলিশ দেখে অস্বস্তি ফুটল চোখে।

'কি মিয়া, তোমার মোজাগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'কই, মোজা নেই!' বিমূঢ়ের মত ট্রাউজারের নিচের দিক উঁচু করে দেখাল ডুরেক। খালি পা।

'আমি জানতে চাইছি, কোথায় রেখে এসেছ?'

ডুরেক জবাব দেয়ার আগেই মুসা বলে উঠল, 'আগে ওকে চাঁদিটা দেখাতে বলুন, ক্যাপ্টেন।'

'ক্যাপ খোলো,' আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। 'মাথাটা নোয়াও। ওরা দেখুক।'

আরও বোকা হয়ে গেল ডুরেক। কি সব করতে বলা হচ্ছে তাকে। তবে যা বলা হলো, করল।

এক পলক দেখেই চিৎকার করে উঠল মুসা, 'এই তো! সেই চাঁদি! সেই টাক! কি বিচ্ছিরি দেখতে! এ জন্যেই সারাক্ষণ ক্যাপ পরে থাকে।'

বিড়বিড় করে কি বলল ডুরেক, বোঝা গেল না।

'ক্যাপ্টেন,' আবার বলল মুসা, 'এ লোকটাকেই সেদিন গাছে চড়তে দেখেছিলাম। আমি শিওর।'

'গুড,' মাথা দুলিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। ডুরেকের দিকে ফিরলেন। 'অ্যাই মিয়া, আরেকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। হারটা কোথায় লুকিয়েছ?'

বিশ

গোমড়া মুখটা আরও গোমড়া হয়ে গেল ডুরেকের। 'পাগল নাকি! কি সব বলে? একবার জিজ্ঞেস করে মোজার কথা, একবার চাঁদি দেখে, এখন বলে হার। কিসের হার? কোনও হারের কথা আমি জানি না।'

'তাই নাকি?' কঠোর হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চোয়াল। 'না জানার ভান করে আর কোন লাভ নেই, ডুরেক। সব কথা জেনে গেছি আমরা। কি করে রন-পা'র সাহায্যে দেয়াল টপকেছ, ওরিয়ন ফোর্টে ঢুকে হার চুরি করেছ, রন-পাগুলো তারপর কোনখানে ছুঁড়ে ফেলেছ। সব।'

'আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ডুরেক। তবে গলায় জোর নেই আগের মত। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

'ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'দেয়ালের কাছে রন-পা'র দাগ রেখে এসেছ তুমি।' পকেট থেকে কিশোরের দেয়া সূত্রগুলো বের করলেন। 'এই টুপিটা ফেলে এসেছ গাছের ডালে, এই উলের সুতোটা ছিঁড়ে রেখে এসেছ তোমার মোজা থেকে। তোমার রন-পাগুলো পাওয়া গেছে হলি ঝাড়ের মধ্যে। এত কাণ্ড শুধু শুধু করোনি। এখন বলে ফেলো, হারটা কোথায়?'

ডুরেককে চুপ করে থাকতে দেখে কঠোর পুলিশী কণ্ঠে ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'কি হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'আ-আমি তো কিছু জানি না,' আমতা আমতা করে বলল ডুরেক। 'তবে এখন মনে হচ্ছে, শেফার্ড ওটা নিয়ে পালিয়েছে। আমাকে ফাঁসানোর জন্যে চালাকি করে আমার জিনিসপত্র পরে চুরি করতে গিয়েছিল।'

'শেফার্ডটা কে? কাল রাতে যে লোকটা ক্যারাভানে করে চলে গেছে সে তো? না, হার সে নেয়নি,' কিশোর বলল। 'হারটা আশেপাশেই কোথাও আছে। কাল রাতে আপনারা যখন কথা বলছিলেন বাক্সের নিচে লুকিয়ে থেকে সব শুনেছি আমি আর মুসা।'

চমকে গেল ডুরেক। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। কিছু বলল না।

'আপনি যে বলেছেন, সিংহেরা পাহারা দেবে, সেটাও শুনেছি,' কিশোর বলল। 'বলেননি?'

এবারও ডুরেক নির্বাক।

'বেশ,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'খোঁজাখুঁজিটা তাহলে আমাদেরই করতে হচ্ছে। সিংহের খাঁচাটা থেকেই শুরু করি।'

দু'জন পুলিশ আর সাতজন গোয়েন্দার বিশাল বহর নিয়ে সিংহের খাঁচার দিকে রওনা হলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে মিছিল করে চলল জনা তিরিশেক সার্কাসের লোক। খুদে ভালুকছানাটাও কি করে যেন ছাড়া পেয়ে গেছে। মহা আনন্দে লাফাতে লাফাতে ওটাও চলল জনতার সঙ্গে।

খাঁচার কাছে এসে সিংহের ট্রেনার কোথায় জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একজন লোক। অবাক হয়েছে। শঙ্কিতও।

'নাম কি আপনার?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'আলবার্তো,' জবাব দিল লোকটা।

'মিস্টার আলবার্তো, আমাদের ধারণা, আপনার সিংহের খাঁচায় একটা মূল্যবান মুক্তোর হার লুকানো আছে। আপনি কিছু জানেন?'

আলবার্তোর চোখ দেখে মনে হলো কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। এমন করে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে, যেন ভুল শুনছে।

'যান, খাঁচায় ঢুকে খুঁজে বের করুন ওটা,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

খাঁচার দরজার তালা খুলল আলবার্তো। ভঙ্গিতে অবিশ্বাস। সিংহগুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু গরগর করল একটা সিংহ।

খাঁচার মেঝের তক্তাগুলো জুতোর ডগা দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল আলবার্তো। কোনটা থেকেই ফাঁপা শব্দ বেরোল না। আলগা হয়েও নেই কোনটা। ফিরে তাকাল। খাঁচার বাইরের সবগুলো চোখ এখন তার দিকে। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'না, স্যার, নেই এখানে। সিংহের কেশরেও লুকিয়ে রাখা সম্ভব না। চুলকাতে গিয়ে ফেলে দেবে।'

ডুরেকের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে ঘন ঘন। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন, পানির পাত্রটায় দেখতে বলুন!'

ক্যাপ্টেন বলার আগেই ওটার দিকে এগিয়ে গেল আলবার্তো। তুলে নিয়ে কাত করে ফেলে দিল সমস্ত পানি। 'কই, নেই তো!'

'উপুড় করুন!' কিশোর বলল।

পাত্রটা উপুড় করল আলবার্তো। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। 'একি!' দেখা গেল, ঝালাই করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে একটা পাত। 'এটা তো আগে ছিল না!'

পাত্রটা বের করে আনা হলো। সার্কাসের লোকের কাছ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার চেয়ে নিল কিশোর। সেটার মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে সহজেই খুলে ফেলল পাতলা টিনের পাতটা। ভেতর থেকে বের করে আনল একটা মুক্তোর হার। পানির পাত্রের নিচে বেশ কায়দা করে ছোট্ট একটা কুঠরি বানিয়ে, তার ভেতরে হারটা রেখে, পাত লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

হারটা পাওয়ার পর এমন হট্টগোল শুরু হলো, ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন করে উঠল একটা সিংহ। ওটার দেখাদেখি বাকিগুলোও অস্থির হয়ে ডাকতে শুরু করল। শান্ত করতে গেল আলবার্তো।

সিংহের গর্জনে ভয় পেয়ে ফারিহার পা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল ভালুকছানাটা। আশ্রয় খুঁজল তার কাছে। নিচু হয়ে তুলতে গেল ফারিহা। পারল না।

হারটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পকেটে রেখে দিলেন

ক্যাপ্টেন। হেসে বললেন গোয়েন্দাদের, 'পুলিশের তরফ থেকে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ডুরেকের চেঁচামেচি শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, হাতকড়া লাগিয়ে দিচ্ছে দু'জন অফিসার। তাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল। সামনে একটা কাপড় ঝোলানোর দড়ি পড়ল। তাতে রয়েছে সেই মোজা জোড়া। বাতাসে দুলে দুলে যেন জানিয়ে দিতে লাগল ডুরেকের শয়তানির কথা।

'চলো,' গোয়েন্দাদের বললেন ক্যাপ্টেন, 'মিসেস ওরিয়নের সঙ্গে দেখা করে আসি। কি করে হারটা উদ্ধার করলে, তোমরাই তাঁকে বোলো। বলা যায় না, বড় কোন পুরস্কারও তোমাদের দিয়ে ফেলতে পারেন তিনি। ফারিহা, কি পুরস্কার চাও?'

ভালুকছানাটার দিকে তাকাল ফারিহা। এখনও ওটা তার পা ঘেঁষে রয়েছে। 'উনি কি আমাকে একটা ভালুকের বাচ্চা দিতে পারবেন? এটার মত? তবে আরও ছোট, ওজন কম, যাতে কোলে নিতে পারি। অনিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে-ও ভালুকের বাচ্চাই চাইবে।'

জোরে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'দারুণ উপহার চাইলে তো।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'কি, কিশোর? তুমি কি চাও?'

'আপনাদের খাতায় তো অনেক অসমাপ্ত রহস্যের কথা লেখা থাকে, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'ওগুলোর কোন একটা কেস যদি দেন।'

'সমাধান করার জন্যে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নিশ্চয়!' জবাব দিতে একটুও দেরি হলো না তার।

***

মেডেল রহস্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১

এক

লম্বা ছুটি। রকি বীচ থেকে গ্রীনহিলসে চলে এসেছে আবার কিশোররা। প্রতি বছরই দীর্ঘ দিনের জন্যে আসে এ-রকম। ছুটি শেষ হলে ফিরে যায়।

সেদিন বিকেল বেলা লধশের অন্যান্য সদস্যদের ফোন করল কিশোর ও মিশা। বলল মীটিং বসছে ছাউনিতে। বেশ বড় একটিন চকলেট বিস্কুট পাওয়া গেছে, সেকথাও জানাল। কারও কাছে ড্রিংক-ট্রিংক কিছু থাকলে নিয়ে আসার অনুরোধ জানাল কিশোর। বলল, মগ সরবরাহ করা যাবে।

শেষ ফোনটা করে রিসিভার রাখতে রাখতে বিরক্ত কণ্ঠে বলল সে, 'দূর, টেলিফোনে কথা বলতে ভাল্লাগে না! এত বেশি বকবক করে সবাই, মাথা ধরে যায়।'

'মুসা আর ববের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমিই কি কম বকবক করো?' মুখের ওপর বলে দিল মিশা। 'যাকগে ওসব কথা। মুসার সাথে কথা বলার সময় বাবলি শুনে ফেলেছে বললে, গোলমাল করবে না তো? মীটিঙে বসছি যে সেকথা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে।'

মেরিচাচীর বোনের মেয়ে সে। বোন মারা গেলে মিশাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন তিনি।

'সুযোগ পাবে না। মুসা বলল, কাল নাকি যেমন-খুশি-সাজো খেলায় যোগ দিতে যাচ্ছে বাবলি। পার্টি দিচ্ছে ওর এক বন্ধু।

'নিনা নিশ্চয়?'

'মনে হয়। জিজ্ঞেস করিনি।'

অনেক দিন মীটিং বসে না, আগোছাল আর নোংরা হয়ে আছে ঘরটা। পরদিন মীটিঙের আগেই ঢুকে সেসব পরিষ্কার করে ফেলতে লাগল কিশোর ও মিশা মিলে।

মীটিং শুরু হবে পাঁচটায়। অপেক্ষা করছে কিশোর, মিশা আর টিটু। পাঁচটা পাঁচ বেজে গেল। কেউ এল না। জুলজুল করে বিস্কুটের টিনটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে টিটু আর জিভ চাটছে। তারপর হঠাৎ করেই গুঙিয়ে উঠল। পায়ের শব্দ

শুনতে পেয়েছে।

'আসছে,' কিশোর বলল।

দরজায় টোকা পড়ল।

'সঙ্কেত বলো,' ভিতর থেকে বলল কিশোর।

একসাথে জবাব দিল অনিতা আর ডলি, 'ছুটি।'

দরজা খুলে দিয়ে হেসে ডাকল কিশোর, 'এসো।'

আবার কেউ এল।

সঙ্কেত জিজ্ঞেস করল কিশোর।

রবিন জবাব দিল, 'ছুটি।'

তার পর পরই এল বব। ভিতরে ঢুকে বলল, 'যাক, আবার তাহলে একসাথ হওয়া গেল। ঘরটা অন্ধকার! আজ বিকেলটাই কেমন অন্ধকার।'

'শুধু মুসা বাকি,' কিশোর বলল। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। 'ও এখনও আসছে না কেন?'

এল মুসা। মীটিং শুরু হতে যাবে এই সময় আচমকা গরগর শুরু করল টিটু। পাহারার দরকার মনে করেনি কিশোর, তাই টিটুকে বাইরে বসায়নি। ও বসে আছে ঘরের কোণে। গরগর করেই চলল সে। অবাক হয়ে সবাই তাকাল তার দিকে।

'কি রে টিটু, কী হয়েছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। জবাবে আরও জোরে গরগর করে উঠল কুকুরটা।

'এই, কী হয়েছে? আরে, মুসার দিকে চেয়ে ওরকম করছে কেন?' ডলি বলল। 'ওরকম করছিস কেনরে? আবার দাঁতও খিঁচাচ্ছে। মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি...'।

'আমাদের কাউকে দেখে আগে তো কখনও ওরকম করেনি!' মিশা বলল। 'এই টিটু, চুপ কর। মাথায় হ্যাট পরেছ কেন? খুলে ফেলো। বোধহয় যে-জন্যেই ও ওরকম করছে।'

কিন্তু হ্যাট খুলল না মুসা। মুখ ঘুরিয়ে রইল আরেক দিকে।

হঠাৎ থাবা দিয়ে তার মাথা থেকে হ্যাটটা ফেলে দিল বব। অবাক হয়ে গেল সবাই। রেগেও গেল। হ্যাটের নিচ থেকে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল লম্বা চুল।

'বাবলি!' রাগে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'এত্তবড় সাহস তোমার! ফাঁকি দিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢোকো! মুসার জামা কাপড় পরেছ বলেই ভেবেছ টিটুর চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবে...যাও, বেরোও!'

'যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি,' ফিকফিক করে শয়তানী হাসি হাসল বাবলি। 'কি করে ঢুকলাম সেটা জিজ্ঞেস করলে না? পার্টিতে যাচ্ছিলাম। আমাকে নিতে এসেছে নিনা। বাইরে লুকিয়ে আছে এখন ও। ছেলে সাজার জন্যে মুসার কাছ থেকে তার কাপড় চেয়ে নিয়েছি। আর জানোই তো, আমার গলার স্বরটাও অনেকটা ওরই মত। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থেকে ডলিকে সঙ্কেত বলতে শুনেছি, চেঁচিয়ে কথা বলে তো। হি-হি। কেমন ফাঁকিটা দিলাম! নিজেদের বেশি চালাক ভাবো যে...'

'ফাঁকি সত্যিই দিয়েছ, স্বীকার করছি,' বব বলল। 'টিটু না থাকলে...যাও, বেরোও এখন।'

'যাচ্ছি যাচ্ছি,' হাত তুলল বাবলি। 'যা করতে চেয়েছিলাম, করেছি, এখন আমি খুশি।' আবার শয়তানী হাসি ছড়াল মুখে। 'কাল ফোনটা আমি ধরেছিলাম। মুসার গলা নকল করে কথা বলেছি, ও তখন বাড়ি ছিল না। পরে যখন এল, বললাম সাড়ে পাঁচটায় মীটিং, পাঁচটায় না। কাজেই ও যে দেরি করে আসছে এটা ওর দোষ না। তা কিশোর মিয়া, কি মনে হয়, লধশে ঢোকার উপযুক্ত আমি?'

আর সহ্য করতে পারল না কিশোর। বাবলিকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল দরজার কাছে। একটানে দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'বেরোও!'

বাবলি চেঁচিয়ে বলল, 'নিনা, এইবার!'

ঝপাত করে একবালতি পানি এসে পড়ল ঘরের ভিতরে। কিশোর তো বটেই, অন্যদেরও গা ভিজে গেল। ততক্ষণে একলাফে বাইরে চলে গেছে বাবলি। খিলখিল করে হেসে উঠল সে আর নিনা।

লধশদের পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়ে বাবলি বলল, 'গরম একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলে তো, তাই ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলাম। এসো নিনা, যাই।'

দুই

রাগে স্তব্ধ হয়ে গেল লধশরা। মুঠো তুলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'বাবলি, মনে রেখো, এর শোধ আমি না নিয়েছি তো আমার নাম কিশোর পাশা নয়!'

জবাবে আবার শোনা গেল গা জ্বালানো খিলখিল হাসি।

ওদিকে মুসা জেনেছে সাড়ে পাঁচটায় মীটিং। সময়মত যাবার জন্যে রওনা হয়েছে, এই সময় হাসতে হাসতে এসে হাজির হলো বাবলি আর নিনা। কী করে

এসেছে জানাল মুসাকে। শুনে তো সিঁড়িতেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুসা।

তাকে আরও রাগানোর জন্যে বাবলি বলল, 'ইস, পানিটা যা সই করে ছুঁড়েছে না নিনা, যদি দেখতে! তোমাদের পিচ্চি শার্লক হোমসটা দলবলসহ ভিজে একেবারে চুপচুপে।'

'তোমাকে কেউ চিনল না?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'গাধা তো, চিনবে কিভাবে। টিটুটা না থাকলে আজ মীটিঙের আলোচনাও শুনে আসতাম। ওই কুত্তাটাই ধরিয়ে দিল।'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল মুসা। অনেক দেরি করে ফেলেছে। মীটিঙে গিয়ে এখন আর লাভ নেই। কিশোরকে ফোন করতে চলল।

ফোন ধরল মিশা। বলল, 'মুসা, সত্যিই তুমি তো? নাকি বাবলি, গলা নকল করে কথা বলছ?'

'না, না, আমি সত্যিই মুসা। ওই শয়তানটার মাথা ভাঙব আজ আমি। তা মীটিং তো নিশ্চয় আজ আর হচ্ছে না?'

'নাহ্। এ-রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে সবারই। এই অবস্থায় বসা যায় না।'

'আবার কবে মীটিং?'

'কিশোর বলল কাল রাতে সবাইকে আসতে।'

সুতরাং, পরের সন্ধ্যায় আবার ছাউনিতে মিলিত হলো ওরা। এইবার আর মুসা ঢোকার পর তাকে দেখে রাগল না টিটু। তবু কিশোর তাকে ভালমত পরীক্ষা করার পর সবাই সন্তুষ্ট হলো, বাবলি নয়, মুসাই।

মুখ গোমড়া করে রেখেছে মুসা। তাকে খুশি করার জন্যে ডলি বলল, 'অকাজ করেছে তোমার বোন। তুমি মন খারাপ করে আছো কেন?'

তাই তো,' কিশোর বলল। 'তুমি ওরকম করছো কেন? বাবলিটা তো চিরকালই শয়তান। তা ছাড়া দোষ তো আমাদেরও আছে। আমরা চিনলাম না কেন?···এই টিটু, দরজা পাহারা দে গিয়ে।'

উঠে দরজার কাছে চলে গেল টিটু।

নিরাপদেই মীটিং হলো সেদিন। চকলেট দেয়া বিস্কুটের টিনটা বেশ বড়। প্রত্যেকে ভাগে ছ'টা করে বিস্কুট পেল। টিটুও বাদ পড়ল না। দরজার কাছে বসেই খেল সে। আর কান খাড়া রাখল সন্দেহজনক শব্দ শোনার আশায়।

'এখন আসল কথা শুরু করা যাক,' বিস্কুট আর লেমোনেড শেষ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমাদের এই ক্লাব টিকিয়ে রাখতে হলে কাজ

করা দরকার। অনেক দিন কিছু করছি না আমরা।'

'কি করব?' ডলির প্রশ্ন। 'রহস্য-টহস্য তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে সাহায্য করব? মীটিঙের নামে ছাউনিতে এসে অকারণে বসে থাকা আর খাওয়া আমারও ভাল লাগছে না।'

'আমারও না,' মিশা বলল। 'এ-ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে কিছু একটা করা দরকার।'

'কিন্তু কী করব?' অনিতা বলল।

'আমারও সেটাই প্রশ্ন,' কিশোর বলল চিন্তিত ভঙ্গিতে, কি করব? একটা কিছু ভেবে বের করা দরকার। অনেকগুলো ব্রেন আছে আমাদের। ভাবো, সবাই ভাবো।'

দীর্ঘ নীরবতা। সবাই ভাবছে। অবশেষে মিশা বলল, 'এ-ভাবে বের করা যাবে না।'

'একটা কোন রহস্যের সমাধান তো করতে পারি আমরা?' বলল বব। 'কিংবা কাউকে সাহায্য, ওই যে ডলি বলল তখন।'

'রহস্য একটাই মনে পড়ছে আমার,' হেসে বলল রবিন। 'আমাদের হেডস্যারের চেয়ারটা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল কে সেটা বের করার চেষ্টা করতে পারি। বেচারা স্যার। চেয়ারের ওই দশা দেখে তাঁর মুখের যা অবস্থা হয়েছিল না···'

'দূর, এটা কোন রহস্য হলো নাকি,' হাত নাড়ল ডলি। 'ভাল করেই জানি ও কাজ কারা করেছে। বাবলি আর নিনা।'

অনিতা বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রবিনই বলল, 'আরেকটা রহস্যের কথা মনে পড়ছে। জেনারেল মরিসনের মেডেলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে কেমন হয়? চুরি হয়ে গেছে ওগুলো, জানোই তো।'

অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকাল বব। 'কিভাবে চেষ্টা করব? পুলিশ তো কত চেষ্টা করল, মেডেলগুলোর কোন হদিসই করতে পারল না।'

'জানি। আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন তো,' রবিন বলল, 'তাঁর সব খবরাখবরই রাখি। কাল গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। বাগানে ছিলেন তিনি তখন। মেডেলগুলোর কথা অনেকবার বললেন। খুব প্রিয় ছিল তাঁর ওগুলো। বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন।'

আবার চুপ হয়ে গেল সবাই। বয়স্করা সাধারণত কাঁদে না, আর সৈনিকরা

তো আরও কম কাঁদে। কতখানি দুঃখ পেলে জেনারেলের মত একজন বৃদ্ধ সৈনিক কাঁদতে পারেন, আন্দাজ করতে পারল ওরা।

কারও মুখে কথা নেই। এই নীরবতা টিটুর কাছে অস্বাভাবিক লাগল। মৃদু কুঁইকুঁই করে উঠল সে।

'আরে না না, টিটু, ভয়ের কিছুই নেই,' তাড়াতাড়ি বলল মিশা, 'আমরা ভাবছি। একজন মানুষের দুঃখের কথা ভাবছি। তোরা তো কাঁদিস না, কাজেই ওসব ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারবি না।'

আবার কোঁ-কোঁ করলে টিটু, যেন মিশার কথার প্রতিবাদ করল।

বব জিজ্ঞেস করল রবিনকে, 'চুরি হয়ে যাওয়া মেডেলগুলোর পরিবর্তে আর নতুন মেডেল দেয়নি সরকার?'

'না, তা কী আর দেয়। দেয়ার নিয়মও নেই, সম্ভবও না। তা ছাড়া কিছু মেডেল তিনি পেয়েছিলেন বিদেশী সরকারের কাছ থেকে। শুনেছই তো খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলেন তিনি। তাঁর মত একজন মানুষকে এ-ভাবে কাঁদতে দেখে খুব খারাপ লেগেছে আমার। খুব ক্ষতি করে দিয়েছে চোরটা। মেডেলগুলো তাঁর কাছে শুধু মেডেলই ছিল না, ওগুলো দেখে দেখে পুরানো দিনের কথা ভাবতেন তিনি। জিনিসগুলো খুঁজে বের করে আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে খুব খুশি হতাম।'

মন খারাপ করে বসে আছে ডলি আর অনিতা। দেখে মনে হচ্ছে, জেনারেলের দুঃখে ওরাও কেঁদে ফেলবে।

'মেডেলগুলো খোঁজা উচিত আমাদের,' হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল ডলি। 'কিভাবে করব জানি না, তবে অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'অযথা, কোন লাভ হবে না,' কিশোর মাথা নাড়ল। দু-তিন বার ঘন ঘন চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। 'বের করার কোন উপায়ই দেখছি না আমি। তারচেয়ে বরং অন্য কাজ করি, চলো।'

'কি কাজ' মুসা জানতে চাইল।

'এখন পাখিদের বাসা বাঁধার সময়। ডিম পাড়বে। ব্র্যামলি উডসে চলে যেতে পারি আমরা। শুনেছি, দুষ্ট ছেলেরা গিয়ে ওখানে পাখির বাসা ভাঙে, ডিম চুরি করে, বাচ্চা মেরে ফেলে। ওদেরকে বাধা দিতে পারি আমরা, বাসা যাতে না ভাঙে। আমরা সাতজন, দলটা নেহাত ছোট না। তা ছাড়া টিটু তো রয়েছেই।'

'হুফ!' যেন সব বুঝতে পেরে কিশোরের সঙ্গে একমত হলো টিটু।

আলোচনা চলল। ওরা ঠিক করল, একই সাথে দুটো কাজ হাতে নেবে ওরা।

জেনারেলের মেডেলও খুঁজবে, পাখির বাসার ওপরও নজর রাখবে।

'করতে পারলে তো ভাল হত,' বব বলল। 'কিন্তু একসাথে কি দুটো কাজ সম্ভব? পারব?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি?' মিশা বলল। 'পারতেও পারি। কাজে না নামলে জানব কিভাবে?'

তিন

আর বেশিক্ষণ বাগানে থাকতে পারল না ওরা। কারণ, ডাক শোনা গেল ঘর থেকে।

'চাচি, ডাকছেন।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'মিশা, এবার যাওয়া দরকার। এত বেজে গেছে খেয়ালই করিনি। মীটিঙে বসলে কিভাবে যে সময় কেটে যায়!'

'তা ঠিক,' একমত হলো বব। 'কিন্তু কিশোর, আমাদের কথা এখনও শেষ হয়নি। কিভাবে কী করছি আমরা? জেনারেলের কাছে কারও যাওয়া দরকার। মেডেলগুলো সম্পর্কে আরও খোঁজ খবর নিতে–কবে চুরি হয়েছে, কিভাবে, এ সব।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। রবিন যাবে। ওদের পাশের বাড়িতেই থাকেন যখন। কি রবিন, পারবে না?'

'পারব। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞেস করলে আবার কী মনে করেন...'

'মনে করবেন কেন?' ডলি বলল। 'তিনি তো তোমাকে চেনেনই। তাঁর সামনে খুব দুঃখ করতে থাকবে–সেটা তুমি ভালই পারো। মন গলিয়ে ফেলতে পারলে জবাব না দেয়ার তো কোন কারণ দেখি না।'

'আর আমরা যাব পাখির বাসা পাহারা দিতে,' কিশোর বলল। 'একসাথেও যেতে পারি, আলাদা হয়েও যেতে পারি। একলা গেলে ব্যাজ পরে যাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব, ক্লাবের তরফ থেকে অর্ডার আছে আমাদের ওপর পাখির বাসা পাহারা দেয়ার জন্যে।'

'লোকের নামধাম জিজ্ঞেস করতে হবে না তো?' শঙ্কিত হয়ে বলল অনিতা।

'বাসার কাছে কাউকে ঘুরঘুর করতে দেখলে ইচ্ছে হলে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে পারো, অসুবিধে কি? জিজ্ঞেস করলেই যে বলবে, তা না-ও হতে পারে,

বিশেষ করে বড়রা। তবে দুষ্টু ছেলেরা চমকে যাব। ইদানীং পাখি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এত বেশি লেখালেখি, হৈ-চৈ হচ্ছে, সতর্ক হয়ে গেছে পুলিশ। বাসা যাতে নষ্ট না করা হয়, এ-ব্যাপারে অনুরোধ জানানো হয়েছে সবাইকে।'

'একা গিয়ে সুবিধে করতে পারব না,' মুসা বলল। 'তারচেয়ে বরং দুতিনজন একসাথে যাই। একলা গেলে পাত্তাই দেবে না আমাদেরকে শয়তান ছেলেগুলো।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো কিশোর। 'দায়িত্বটা তাহলে তোমার ওপরই থাকল। কাকে কাকে নেবে, কিভাবে যাবে, সেটা তুমিই ঠিক করো। চারদিনের মধ্যে রিপোর্ট করবে। আর তার আগেই যদি মীটিঙে বসতে চাও, একটা নোট ফেলে যাবে ছাউনিতে। আমার কিংবা মিশার চোখে পড়বেই। কারণ রোজই আমরা একবার করে ঢুঁ মেরে যাব।'

'আচ্ছা,' মুসা বলল। 'ওই যে, আন্টি আবার ডাকছেন। চলো, উঠি। নইলে বকা খাবে তোমরা।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল কিশোর আর মিশা বাদে বাকি পাঁচজন। কিশোর দরজা বন্ধ করল। তারপর মিশা ও টিটুকে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হলো।

রান্নাঘরের দরজায় পা দিতেই বলে উঠল ডজের বউ কেরি, 'এত্ত দেরি করলে। ম্যাডাম রেগে গেছেন। কখন থেকে খাবার নিয়ে টেবিলে বসে আছেন। জলদি যাও।…আরে ওভাবে যাচ্ছে কেন? হাতমুখ ধুয়ে যাও…'

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলেছে রবিন। মনে ভাবনার ভিড়। জেনারেলকে জেরা করার গুরু দায়িত্বটা তাকে দেয়া হলো! যদি তিনি রেগে যান? ভাবেন, বাচাল ছোঁড়া? অনেকবার রেগে তাঁকে চিৎকার করতে শুনেছে সে। এই তো, গত পরশু গ্রোসারি শপের মালিকের ওপর এমন রাগা রাগলেন! যদি বের করে দেন রবিনকে? কিংবা ওদের বাড়িতে নালিশ করেন তাঁকে বিরক্ত করেছে বলে?

'দূর, যা হয় হবে,' আপনমনেই হাত নেড়ে নিজেকে সাহস জোগাল রবিন। 'ক্লাবের তরফ থেকে আমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, পালন করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? জেনারেলকে না রাগিয়ে কী করে…?'

রাতে বিছানায় শুয়েও ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবল। ঠিক করল, আগামী সকালে জেনারেল যখন মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরবেন, দেয়ালের ওপর দিয়ে একটা বল বাগানে ছুঁড়ে ফেলবে সে। তারপর সেটা ফেরত আনার ভান করে দেয়ালে উঠে বসবে। ওখান থেকেই বলবে, 'মাপ করবেন, স্যার, বলটা পড়ে

গেল। ঢুকব?' তার ধারণা, জেনারেল অমত করবেন না। 'আর ঢুকতে পারলেই,' তুড়ি বাজাল সে, 'কথায় কথায় আসল আলোচনায় চলে যাব। হ্যাঁ, তাই করব।'

সুতরাং পরদিন সকালে একটা বল নিয়ে তার শোবার ঘরের জানালায় তৈরি হয়ে বসল রবিন। অপেক্ষা করছে জেনারেলের জন্যে।…হ্যাঁ, ওই যে তিনি এলেন।…বাগানে ঢুকলেন।…হ্যাঁ, এইবার সময় হয়েছে…

একছুটে নিচে নেমে রান্নাঘর দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল রবিন। জেনারেলের বাগানটা তার চেনা। কোথায় কোন গাছ আছে জানে। অনুমানে একটা ঘন ঝোপ সই করে দেয়ালের ওপর দিয়ে বলটা ছুঁড়ে মারল। কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে উঠে বসল দেয়ালে।

বাগানের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন জেনারেল।

'গুড মর্নিং স্যার,' ডেকে বলল রবিন।

'কে? ও, রবিন। গুড মর্নিং।' তার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করলেন জেনারেল। 'স্কুল নেই?'

'না, স্যার, ছুটি। স্যার, আমি খুবই দুঃখিত। বল খেলছিলাম, দেয়াল টপকে আপনার বাগানে গিয়ে পড়েছে। বের করে নেব? গাছটাছ নষ্ট করব না।'

'আরে নাও নাও, এত ভয় করছ কেন?' হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ জেনারেল। 'ভাল ছেলেদের কখনও বাগানে ঢুকতে নিষেধ করি না আমি। নেমে এসো। এক গ্লাস লেমোনেড খেয়ে যাও আমার সাথে। খাবে?'

আনন্দে নেচে উঠল রবিনের মন। তবে সেটা চেহারায় ফুটতে দিল না। একসাথে বসে লেমোনেড খাওয়া, তারমানে অনেক কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। লাফিয়ে মাটিতে নামল সে। বলটা খুঁজে বের করে নিয়ে এসে জেনারেলের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। বাড়ির দিকে চলেছেন তিনি।

কাছাকাছি এসে চিৎকার করে তাঁর রাঁধুনীর নাম ধরে ডাকলেন, নোরা! নোরা! মেহমান আছে আমার সাথে। দুই গ্লাস লেমোনেড দাও, আর বিস্কুট।'

উঁকি দিল নোরা। রবিনকে দেখে একটা চমৎকার হাসি উপহার দিয়ে গেল। খুদে সিটিংরুমটায় রবিনকে নিয়ে বসলেন জেনারেল। দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য ফটোগ্রাফ, জেনারেল আর তাঁর সৈনিক বন্ধুদের। সবই তাঁর সামরিক জীবনের ছবি। ম্যানটেল-পীসের ওপরটা খালি।

কেন খালি, জানে রবিন। ওখানেই থাকত মেডেলগুলো।

সেদিকে রবিনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল। ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার মেডেলগুলো চুরি হয়ে গেছে, শুনেছ নিশ্চয়। কত কষ্ট করে

যে পেয়েছিলাম ওগুলো! কত ঘাম, কত রক্ত ঝরিয়ে! আমার সৈনিক জীবনের চিহ্ন ছিল ওগুলো। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি। গায়ে শক্তি নেই। ওই মেডেলগুলো দেখলে লোকে অন্তত বিশ্বাস করত, এককালে সিংহের মত লড়াই করেছি আমি। এখন আর করতে চাইবে না। ওগুলো নেই। কী দেখিয়ে ওদের বিশ্বাস করাব...'

গলা ধরে এল জেনারেলের। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোটা চোখের পানি।

মন খারাপ হয়ে গেল রবিনের। এ-ভাবে মানুষটার পুরানো ব্যাথায় খোঁচা দিয়ে দুঃখ দেয়ার জন্যে অপরাধী মনে হতে লাগল নিজেকে। আবেগ সামলাতে না পেরে খপ করে জেনারেলের কোটের হাতা খামচে ধরে কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই কথা দিয়ে ফেলল, 'স্যার, আপনার মেডেলগুলো আমি খুঁজে বের করে দেব।! কাঁদবেন না, স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, যেভাবেই পারি ওগুলো খুঁজে বের করবই!'

এমনভাবে বলল রবিন, কান্না ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন জেনারেল। অবাক রবিন নিজেও হয়েছে। শক্ত করে রবিনের হাত চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন জেনারেল। বললেন, 'হ্যা, হ্যাঁ, পারবে! তুমিই বের করতে পারবে! তোমার কথা শুনে এত ভাল লাগছে যে কী বলব। একদিন তুমি আমার হারানো মেডেল খুঁজে এনে দিতে পারবে।...কে, নোরা? কী চাও? মেহমান এসেছে দেখছ না?'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি আবার মেডেলের কথা ভেবে মন খারাপ করছেন,' কোমল গলায় বলল নোরা। 'ছেলেটাকে ছেড়ে দিন, বাড়ি চলে যাক। আপনি ঘুমোন। সারারাত ঘুমোননি, খালি ছটফট করেছেন। শুয়ে পড়ুন এখন।'

আর ওখানে থাকা উচিত মনে করল না রবিন। জেনারেলকে বিদায় জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে। নোরার আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে ঢুকল নোরা। রবিনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ও তুমি, যাওনি এখনও। মেডেলগুলোর কথা বলা একদম উচিত হয়নি তোমার। এমনিতেই দিনরাত ওগুলোর কথা ভাবেন। তার ওপর কেউ মনে করিয়ে দিলে তো আর কথাই নেই।'

'কে চুরি করেছে, পুলিশ কি জানে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না। আমরা শুধু জানি, একরাতে চোর ঢুকে সবগুলো মেডেল চুরি করে নিয়ে গেছে। আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি। আরেকটা কথা জানি, চোরটা ছেলেমেয়ে যা-ই হোক, হাত খুব ছোট। কারণ জানালার কাচের যে ভাঙা ফোকর দিয়ে হাত

ঢুকিয়ে ছিটকানি খুলেছে, সেটা খুবই ছোট। এত ছোট, তোমার হাতও ঢুকবে কিনা সন্দেহ।'

'ওই যে, ওটা,' হাত তুলে দেখাল নোরা।

'দেখি তো চেষ্টা করে।' পারল না রবিন। চাপাচাপি করে ঢোকাতে গেলে হাত কেটে যাবে। 'মনে হচ্ছে, ছোট কোন মেয়েই শুধু ওখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খুলতে পারবে। কিন্তু ওরকম একটা মেয়ে মেডেল চুরি করতে আসবে কেন?'

'সেটাই তো রহস্য,' নোরা বলল। 'দুঃখে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে মানুষটার। বেশ ভাল একটা পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন, পাঁচশো ডলার, কম না। ভেবেছিলেন কেউ না কেউ পুরষ্কার নিতে এগিয়ে আসবেই। এল না। তবে আশা ছাড়তে পারছেন না। ভাবছেন একদিন না একদিন কেউ আসবেই।'

'পাঁচশো ডলার! এ-তো অনেক টাকা! ইস, মেডেলগুলো যদি পেতাম কোনভাবে! তবে পেলে এমনিই দিয়ে দিতাম, টাকা নিতাম না।'

'তুমি খুব ভাল ছেলে।'

'থ্যাংক ইউ।'

রবিন ভাবল, যাক, পরের মিটিঙে বলার মত কিছু পাওয়া গেল। তবে রহস্যের সমাধান করার মত তেমন কোন সূত্র পায়নি। শুধু জেনেছে, ছোট একটা ফোকর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খুলেছে চোর। এত ছোট ফোকর, একটা বাচ্চা মেয়ের হাতই কেবল ওপথে ঢোকানো সম্ভব। আর রবিনের বিশ্বাস, এত ছোট মেয়ে মেডেল চুরি করতে আসবে না। করেছে বড় মানুষ। তাদের হাতও অনেক বড়। ফোকর দিয়ে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে করল কে?

ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে চলেছে রবিন। ঘড়ি দেখল। বেশি বাজেনি। এখনও গিয়ে ব্র্যামলি হিলে লধশদের পাওয়া যাবে, যদি খুঁজে বের করতে পারে ওদের। ঠিক কোথায় আছে কে জানে।

নিজেদের বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরে উঁকি দিল রবিন। মা কাজ করছেন।

'মা,' অনুরোধ করল সে, 'কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেবে? ব্র্যামলি উডসে যাব। মুসারা রয়েছে ওখানে।'

'বানিয়ে নে না,' মা বললেন, 'আমার হাত বন্ধ। ওই ওখানে বনরুটি আছে। মাখন, মাংস সবই আছে...চাইলে কিছু বিস্কুটও নিতে পারিস...'

'ওহ্ মা, তুমি যে কী ভাল না!' পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে জোরে এক ঝাঁকুনি দিল রবিন। তারপর ছুটল তাকের দিকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে খাবার ভরা হয়ে গেল তার। বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বন্ধুদের খুঁজে পেলেই হয় এখন।

চার

রবিন যখন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলছে, মুসা তখন অনিতা আর ববকে নিয়ে চলেছে ব্র্যামলি উডসে। ওখানে পিকনিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। একই সাথে চোখ রাখবে পাখির বাসার ওপর।

'কাজও হবে, মজাও হবে,' মুসা বলল।

'আমার ভয় লাগছে,' অনিতা বলল। 'যদি সত্যি সত্যি কেউ বাসা ভাঙতে আসে? কী করে ঠেকাব? ওরা ভীষণ পাজি...'

'সে-ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দাও,' বুকে থাবা দিয়ে বলল বব। 'তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে...আরে, কোকিল!'

'ঢিল মারো, ঢিল মারো!' অনিতা বলল।

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মুসা।

'কেন আবার। জানো না, কোকিলেরা অন্য পাখির বাসার ডিম ফেলে দিয়ে সেখানে ডিম পেড়ে আসে? সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায় অন্য পাখি, কোকিলের কোন কষ্ট নেই। সে শুধু ডিম পেড়েই খালাস।'

'তাই নাকি? আশ্চর্য! জানতাম না তো। দারুণ বুদ্ধি ব্যাটাদের। নিজেদের কোন কষ্টই নেই।'

'কুক্কু! কুক্কু! কু-উ-উ-উ!' ডেকে উঠল পাখিটা।

একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ঝোপ সই করে ছুঁড়ে মারল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'যা, ভাগ! যদি তোর এই চোরামি ধরতে পারি, অন্যের বাসায় বসে থাকতে দেখি, সোজা ডিমগুলো তুলে নিয়ে ভেঙে ফেলব! ভাগ, ভাগ!'

ঝোপ থেকে উড়ে গিয়ে উঁচু গাছের ডালে বসল পাখিটা। তারপর যেন মুসাকে ব্যঙ্গ করেই আবার ডেকে উঠল, 'কু-উ-উ-উ-উ!'

বনের ভিতর আর কারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে স্বস্তি বোধ করছে

অনিতা। সুন্দর এই সকালে পাখির বাসা ভাঙা নিয়ে কারও সাথে ঝগড়া বাধাতে ইচ্ছে করছে না তার। বনের ভিতর ঘুরতে লাগল ওরা। অনেক প্রিমরোজ ফুল তুলে নিল অনিতা।

'অনেক তো ঘুরলাম,' একসময় বলল সে। 'এবার একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়? বসে আপেল খেতে খেতে পাখির গান শুনব।'

কথাটা অন্য দুজনেরও পছন্দ হলো। একটা জায়গা বেছে নিয়ে মাটিতেই বসে পড়ল। কথা শোনা গেল এই সময়। গাছের আড়াল থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল তিনজন কিশোর, ওদেরই বয়েসী। ওদের দেখতে পায়নি। সোজা গিয়ে দাঁড়াল একটা গাছের নিচে। হাত তুলে ওপর দিকে দেখাতে লাগল একজন।

'এই, নিশ্চয়ই বাসা দেখেছে!' ফিসফিসিয়ে বলল অনিতা।

'মনে হয়,' মাথা ঝাঁকাল বব।

ঠিকই অনুমান করেছে ওরা। গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল একটা ছেলে। উঠে পাতার ফাঁকে কিছু দেখে নিয়ে চিৎকার করে নিচের বন্ধুদের বলল, 'ব্ল্যাকবার্ডের বাসা! চারটে ডিম আছে! সব নিয়ে আসব?'

'তিনটে আন,' নিচ থেকে জবাব দিল একজন। 'প্রত্যেকের জন্যে একটা করে।'

'এসো, যাই,' উঠে দাঁড়িয়ে ববকে বলল মুসা।

ছেলেদের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ভদ্রভাবে মুসা বলল, 'এই শোনো, তোমরা নিশ্চয় জানো পাখির ডিম নষ্ট না করতে অনুরোধ করা হয়েছে আমাদের। গত বছর এত বেশি নষ্ট করা হয়েছিল, ভয় পেয়ে এই এলাকা ছেড়েই চলে গিয়েছিল পাখিরা। এ-বছর আবার কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে...'

'আহারে, কী পক্ষী প্রেমিক আমার!' জোরে হেসে উঠল একটা ছেলে। 'একেবারে পাদ্রী সাহেবের মত কথা বলছেন। নেরি, একটা ডিম দে তো ওকে।'

বাসা থেকে একটা ডিম বের করে মুসার মাথা সই করে ছুঁড়ে মারল গাছের উপরের ছেলেটা। ডিমটা ভেঙে মুসার চুল আর গাল বেয়ে গড়াতে লাগল।

'দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!' মাথা থেকে ডিম মুছতে মুছতে দারুণ রাগে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। হাত বাড়িয়ে ডালে বসা ছেলেটার পা চেপে ধরে দিল হ্যাঁচকা টান। টানের চোটে একেবারে মুসার গায়ের ওপর এসে পড়ল ছেলেটা। মুসাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে। গড়াগড়ি শুরু করল দুজনে। একে অন্যের বুকের ওপর চেপে বসার চেষ্টা চালাল।

চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেল একটা ব্ল্যাকবার্ড।

'পেয়েছি!' বলে উঠল তৃতীয় আরেকটা ছেলে। 'আরেকটা বাসা আছে! এসো, দেখি,' সঙ্গীর হাত ধরে টান দিল সে। এবার ওদেরকে ঠেকাতে এগিয়ে এল বব।

মরিয়া হয়ে উঠল অনিতা। আরেকটা বাসার ডিম নষ্ট হবে তার চোখের সামনে, এটা সহ্য করতে পারল না সে। রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল, গলা কাঁপছে তার, 'জানো, আমরা একটা ক্লাবের মেম্বার! এ-সব অসৎ কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে আমাদের! এই যে আমাদের ব্যাজ! ভাল চাইলে চলে যাও!'

ভুরু কুঁচকে তার ব্যাজের দিকে তাকাল ছেলে দুটো। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, 'এই দেখ্ দেখ্, ব্যাজ! হা হা! ব্যাজ! এই খুলে দাও ওটা, বাসায় রেখে দিই। ডিমের বদলে ওটাতেই তা দিয়ে ছানা ফোটাক পাখিরা। হাহ্ হাহ্!'

অনিতার ব্যাজ কেড়ে নিতে গেল ছেলেটা। সেটা ঠেকানোর জন্যে অন্য ছেলেটার হাত ছুটিয়ে উঠে এল মুসা। এগোনোর আগেই পা ধরে টান মেরে আবার তাকে ঘাসের ওপর ফেলে দিল ছেলেটা।

চিৎকার করে বলল মুসা, 'অনিতা, দৌড় দাও! সরে যাও এখান থেকে!' তার ভয় হচ্ছে, অনিতাকেও মারতে আরম্ভ করবে শয়তান ছেলেগুলো। ততক্ষণে ববের সঙ্গেও হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে অন্য ছেলে দুটোর।

ভয় অনিতাও পেয়েছে। দিল দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে এক জায়গায় এসে দেখল গাছের নিচে শুয়ে বই পড়ছে একজন লোক।

একটা মেয়েকে ওভাবে দৌড়াতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। অনিতাকে থামাল। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? ওরকম দৌড়াচ্ছ কেন?'

'জলদি আসুন! বাঁচান!' অনুনয় করে বলল অনিতা। 'পাখির সমস্ত ডিম নষ্ট করে ফেলছে পাজি ছেলেগুলো! আমরা বাধা দিতে গিয়েছিলাম বলে...'

'কোথায়? চলো তো দেখি,' লোকটা বলল।

দৌড়ে ফিরে চলল অনিতা। লোকটা চলল তার সঙ্গে। বব আর মুসার কণ্ঠস্বর কানে আসছে। চেঁচামেচি করছে অন্য ছেলেগুলোও।

একজন বয়স্ক লোককে হঠাৎ আসতে দেখে সাহস পেল বব আর মুসা। ওদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে দুটো ছেলে। বোঝা যায়, ওরাই জিতছে।

কাছে এসে ধমক দিয়ে লোকটা বলল, 'এই ওঠো, ওঠো গায়ের ওপর থেকে! জানো না, পাখির ডিম নষ্ট করা বেআইনী। পুলিশকে গিয়ে বললেই এখন ক্যাঁক

করে এসে কান চেপে ধরবে। নাম বলো জলদি, থানায় রিপোর্ট করব। এই ছেলে, কী নাম তোমার?'

মুসার গায়ের ওপর বসা ছেলেটাকে ধরে টান দিয়ে সরিয়ে আনল লোকটা।

ভয় পেয়ে গেল তিন ডিম-শিকারী। ঝাড়া দিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় দিল মুসার গায়ের ওপর বসেছিল যে ছেলেটা। অন্য দুজনও দাঁড়িয়ে থাকল না। সঙ্গীর পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় থেকে ধুলো-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল বব আর মুসা।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুসা বলল, 'ডিম নষ্ট করতে নিষেধ করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে লেগে গেল।'

'নিশ্চয় কোন ক্লাবের মেম্বার তোমরা,' মুসার ব্যাজের দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা। 'পাখি রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছ বুঝি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল বব।

'খুব ভাল,' বলল লোকটা। 'পাখি আমিও খুব ভালবাসি। আমিও চাই ওদের বাসা নষ্ট না হোক। অনেক বাসা আছে এই বনে। ইতিমধ্যেই চল্লিশটার মত দেখে ফেলেছি আমি।'

'কিন্তু ওদের ডিম তো চুরি করেন না আপনি, তাই না?' অনিতা বলল।

'না না, কী বলো, ডিম চুরি করব কেন? গত কয়েক বছর ধরেই পাখির বাসা নিয়ে গবেষণা করছি আমি, একটা বই লিখব বলে।'

'তাই নাকি?' মজার লোক, ভাবল মুসা। এই লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ভাল লাগবে। 'তা আসুন না, আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিন। অনেক খাবার আছে। চারজনের হয়ে যাবে। খেতে খেতে আপনার কথা শুনব।'

'খাবার আমার কাছেও আছে,' পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজের একটা প্যাকেট বের করল লোকটা। 'স্যান্ডউইচ। ঠিক আছে, এসো, বসে যাই। তোমাদের খাবার থেকে আমি ভাগ নেব, আমার খাবার থেকে তোমরা। ভালই হবে। ওই যে ওই ঘাসগুলোর ওপর বসি। তোমাদের ক্লাবের কথা শুনব।'

ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে খাবারের প্যাকেট খুলল ওরা। খাওয়ার সময় তখনও হয়নি, তবু কোন কারণে–হয়তো পরিশ্রম করেছে বলেই খিদে পেয়ে গেছে ওদের।

স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে লেমোনেডের বোতলে চুমুক দিল অনিতা।

'ভাগ্যিস, আপনি কাছাকাছি ছিলেন,' লোকটাকে বলল বব, 'নইলে মার

খেতে হত আমাদের। ওরা তিনজন, গায়েগতরেও আমাদের চেয়ে বড়। মারও খেতাম, ডিমগুলোও বাঁচাতে পারতাম না। আর আমাদের ব্যাজগুলোও ছিনিয়ে নিতো।...ও, আমাদের ক্লাবের কথা শুনবেন বললেন। শুনুন...'

বেশ গর্বের সঙ্গে লধশদের কথা বলে গেল বব, মুসা আর অনিতা।

আর লোকটাও খুব ভাল শ্রোতা। বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনে যাচ্ছে চুপচাপ।

পাঁচ

'তোমাদের ক্লাবটা তো ভালই মনে হচ্ছে,' লোকটা বলল। ব্যাজগুলোও সুন্দর। নিজেরাই বানিয়েছ বুঝি?'

'মেয়েরা বানিয়েছে,' বব জানাল। 'কিশোরদের বাগানের একটা ছাউনিতে আমাদের হেডকোয়ার্টার। তার দরজায় বড় বড় করে লিখে দিয়েছি লধশ।'

'লধশ' কি, অনেক কষ্টে বোঝাল মুসা। কারণ শব্দটা বাংলা, ইংরেজীভাষী লোকটার বুঝতে অসুবিধে হলো।

'আমরা মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করি, যারা বিপদে পড়ে,' অনিতা বলল। 'কোন রহস্য পেলে তার সমাধানের চেষ্টা করি...'

'তাই নাকি! এখন কী রহস্যের সমাধান করছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'ওহ্হো, আমার নামই তো বলিনি এখনও। আমার নাম ডেরিক, হেনরি ডেরিক। হেনরি বলে ডাকলেই চলবে। মিস্টার-ফিস্টারের দরকার নেই।'

'ঠিক আছে,' মুসা বলল। 'আপনি মাইন্ড না করলে বলব।'

'বেশ,' হেনরি বলল, 'এখন বলো তো, পাখির ডিম বাঁচানো ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কী কাজ করছ তোমরা? জটিল কোন রহস্য-টহস্য...'

'হ্যাঁ, চেষ্টা একটা করা হচ্ছে,' মুসা জানাল। 'দলের এক সদস্য, রবিন, ওদের বাড়ির পাশের একজনকে সাহায্য করতে গেছে। ভদ্রলোকের বাড়িতে চুরি হয়েছিল।'

'কৌতূহল হচ্ছে শোনার,' একটা বনরুটি নিল হেনরি। 'ভদ্রলোকটি কে? তোমরা যে সাহায্য করছ এ-কথা তিনি জানেন?'

'হয়তো এতক্ষণে জেনে গেছেন। আমরা যখন বনের দিকে রওনা হয়েছি, রবিনের তখন ওই বাড়িতে যাবার কথা। জেনারেল জেমস মরিসনের নাম নিশ্চয়

শুনেছেন, আর তাঁর মেডেলের কথা?'

অবাক মনে হলো হেনরিকে। 'জেনারেলের মেডেল চুরি গেছে? উনি তো বিখ্যাত লোক! ওগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছ নাকি তোমরা?'

'হ্যাঁ। আপাতত রবিন করছে। তবে কোন সূত্র পেলে চলে আসবে। মীটিঙে বসব আমরা। সবাই মিলে তার সমাধানের চেষ্টা করব,' বলল বব।

'ভাল বুদ্ধি বের করেছ তো তোমরা। তা কী মনে হয়? মেডেলগুলো বের করতে পারবে?'

'পারলে তো খুবই ভাল হত। শুনেছি জিনিসগুলোর জন্যে পাঁচশো ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সকালে ডাক পিয়নের সঙ্গে দেখা। সে-ই জানাল খবরটা।'

'তাই নাকি?' পিঠ সোজা হয়ে গেছে হেনরির। 'পুরস্কারটা পেলে কী করবে ওই টাকা দিয়ে?'

'টাকা নেবই না,' অনিতা বলল। 'মেডেল পেলে দিয়ে দেব, কিন্তু টাকা নেব না। শুনেছি জেনারেলের দিন এখন খারাপ যাচ্ছে। টাকার খুব টানাটানি। মেডেলগুলো হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছেন, মন খারাপ করে থাকেন সারাক্ষণ।'

ঠিক এই সময় কানে এল জোর চিৎকার: মুসা! বব! কোথায় তোমরা?'

'আরে, রবিন মনে হচ্ছে!' অনিতা বলে উঠল। 'নিশ্চয় জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে কিছু শুনেছে, আমাদের বলতে আসছে। আহ্হা, খাবারও তো সব শেষ করে ফেললাম! জবাব দাও, জবাব দাও!'

আধ মিনিটের মধ্যেই ওদের কাছে চলে এল রবিন। হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ। পরিশ্রমে মুখ লাল। তবে বন্ধুদের খুঁজে পেয়ে চওড়া হাসি ফুটেছে মুখে। ওদের সাথে অপরিচিত লোক দেখে অবাক হয়ে গেছে।

'চিন্তা নেই,' ওরা খেয়ে ফেলেছে শুনে রবিন বলল। 'খাবার আমি নিয়ে এসেছি। তবে পানি আনতে মনে নেই।'

একটা বোতল বের করে দিল বব। 'অনেক লেমোনেড এনেছি। রবিন, চলে এলে যে? জেনারেলের ওখানে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম।' হেনরির দিকে তাকাল রবিন। আবার ববের দিকে ফিরল। 'ইনি?'

'হেনরি ডেরিক,' পরিচয় করিয়ে দিল বব। 'ওনার জন্যেই আজ মার খাওয়া থেকে বেঁচেছি আমরা। ডিম চুরি করেছিল তিনটে ছেলে, আমরা বাধা দিতে গেলে

হামলা করে বসল। সে যাকগে। জেনারেলের কাছ থেকে কী জেনে এলে?'

আবার হেনরির দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল রবিন।

'কিছু হবে না, বলো,' রবিনের মনের কথা বুঝতে পারল বব। 'লধশদের কথা ওনাকে সব বলেছি। সব জানেন। জেনারেলের মেডেল চুরির কথাও। বলে ফেলো, কী জেনে এসেছ। আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারব?'

প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে একটা স্যান্ডউইচ বের করে কামড় বসাল রবিন। কিছুক্ষণ চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দেখা করেছিলাম। দেখা করে বোধহয় আরও ক্ষতিই করে দিলাম তাঁর। মেডেলগুলোর কথা তুলতেই কাঁদতে শুরু করলেন। এত খারাপ লাগল না আমার তখন! তাঁর কান্না দেখে বোকার মত কথা দিয়ে বসলাম। সামলাতে পারিনি নিজেকে, কী যে হয়ে গেল তখন!'

'কি বলেছ?' মুসা জানতে চাইল।

'বললাম, তাঁর জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। মেডেলগুলো আমি খুঁজে বের করে দেব যেভাবেই হোক। কেন যে বললাম! একেবারে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি! কাউকে কথা দিলে সে-কথা তো রাখতেই হয়...'

'বোকামিই করেছ!' অনিতা বলল। 'এ-ভাবে কথা দেয়া উচিত হয়নি। জানো যখন, রাখতে পারবে না। তবে আমার মনে হয় না তিনি বিশ্বাস করেছেন।'

'সেটাই তো সবচেয়ে খারাপ লাগছে। তিনি বিশ্বাস করেছেন। মনে হলেই খারাপ লাগে। দূর, খিদেই নষ্ট হয়ে গেছে!'

'এত মন খারাপ করার কিছু নেই,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল মুসা। 'খেয়ে নাও।'

'মেডেলগুলো ছিল একটা লম্বা বাক্সে, এতটুকু,' হাত দিয়ে বাক্সটা কত বড় দেখাল রবিন। 'দেয়ালের কাছে রাখা ছিল তো। দাগ হয়ে গেছে। দেখেই আন্দাজ করা যায় বাক্সটার সাইজ। চোর ধরার মত কোন সূত্র পাইনি। শুধু জেনেছি, জানালার কাঁচের ভাঙা ফোকর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খোলা হয়েছে। ফোকরটা এত ছোট, খুব ছোট মানুষের হাত ঢুকবে।'

'সূত্র শুধু এটুকুই?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল হেনরি।

'হ্যাঁ।' আবার স্যান্ডউইচে কামড় দিল রবিন। 'আমি মেডেলগুলো খুঁজে বের করে দিতে পারব, এ কথা বিশ্বাস করলেন জেনারেল। বললেন, ওগুলো পেলে পাঁচশো ডলার দেবেন আমাকে। কিন্তু কোত্থেকে দেবেন? তাঁর কাছে অত টাকা আছে বলে মনে হলো না। চলছেন যে কিভাবে কে জানে।'

'জিনিসগুলো কোথায় আছে জানতে পারলে হতো!' রবিনের কথা শুনে অনিতারও মন খারাপ হয়ে গেছে। 'কোথায় লুকানো থাকতে পারে, বলো তো? কে নিল?'

'আমি বলতে পারব,' ওদেরকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল হেনরি। 'মানে, আন্দাজ করতে পারি।'

হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ চারজনে। রবিন হেনরিকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়, বলুন! আমাদেরকে বলতে না চাইলে পুলিশের কাছে গিয়ে বলুন!'

'না, বলার বোধহয় তেমন কিছুই নেই,' চোয়াল ডলল হেনরি। 'তবু, আমার আন্দাজের কথা বলি তোমাদের।'

'বলুন, বলুন!' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না রবিন।

'তোমার বন্ধুদেরকে একটু আগে বললাম, পাখি ভালবাসি আমি। আমার প্রিয় পাখিদের একটা হলো পেঁচা। এখানে, ব্র্যামলি উডসে পেঁচার অভাব নেই। পুরানো গাছে অনেক পেঁচার বাসা। সেরাতে গাছের নিচে শুয়ে আকাশের তারা দেখছিলাম আমি, আর পেঁচার ডাক শুনছিলাম, হঠাৎ...'

'হঠাৎ কি!' অধৈর্য হয়ে সামনে ঝুঁকল রবিন। 'বলুন, থামবেন না!'

'হঠাৎ দেখি কে যেন চোরের মত একটা গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পা টিপে টিপে,' হেনরি বলল। 'তার হাতে কিছু জিনিস। আমাকে দেখেনি। তবে সে কী করছিল, আমি দেখেছি, কারণ তার হাতে টর্চ ছিল।'

'কি করছিল?' নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন বব।

'একটা বাক্স নাড়াচাড়া করছিল, চামড়ার বাক্স। টর্চের আলোয় দেখেছি আমি। তারপর গাছের গুঁড়িতে একটা গর্তের মধ্যে রেখে দিল বাক্সটা। কোন পাখির বাসাটাসা হবে গর্তটা, কাঠঠোকরার হতে পারে। বাক্স রেখে চলে গেল লোকটা।'

'আপনি কী করলেন তখন? ডাকেননি লোকটাকে? দেখতে কেমন?' প্রশ্ন করল রবিন।

'বাক্সটা কি জেনারেলের মেডেলের?' অনিতা জানতে চাইল।

'জানি না। কোন ধরনের চামড়ার বাক্স, শুধু এটুকু দেখেছি। মেডেল রাখা যাবে ওতে।'

'লোকটা চলে যাওয়ার পর নিশ্চয় গিয়ে গর্তের ভিতর দেখেছেন,' বব বলল। 'কি পেলেন?'

'গর্তটা ঠিকই দেখেছি। তবে বাক্সটা পাইনি। এত সরু, আমার হাত ঢোকেনি ভিতরে। অনেক চেষ্টা করেছি ঢোকানোর। কাজেই বাক্সে যে কী ছিল বলতে পারব না। হতে পারে মেডেল, হতে পারে অন্য কোন জিনিস। চুরি করে এনেছিল।'

'মেডেল হলে এখুনি জেনারেলের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত,' রবিন বলল। 'চলুন চলুন, গাছটা দেখান। অনিতার হাত সরু, হয়তো ঢুকবে। চোরটারও হাত সরু, জানি আমরা। চালাকি করে ও এ-রকম কোন গর্তেই রাখবে, যেখানে মোটা হাত ঢুকবে না। গাছটা কোথায়?'

'কেন দেখাব তোমাদের?' ওদেরকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল লোকটার কণ্ঠস্বর। 'পুরস্কারের ব্যাপারটা কী হবে, সেটা বলো আগে।'

'ওই পাঁচশো ডলার? নিশ্চয় আপনি সেটা চান না?' অনিতা বলল। 'জেনারেল এখন খুব অভাবে আছেন...'

'ওসব আমি শুনতে চাই না,' বাধা দিয়ে লোকটা বলল। 'টাকাটা তোমাদের সঙ্গে বরং ভাগাভাগি করে নিতে পারি। চারশো ডলার আমার, বাকি একশো তোমাদের। জলদি মন ঠিক করো। চোরটা যে কোন সময় ফিরে এসে বাক্সটা বের করে নিয়ে যেতে পারে। তাহলে ওই একশোও যাবে।'

'আমরা একটা পয়সাও নেব না!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল রবিন। 'গাছটা দেখান আমাদের। জলদি করুন! মেডেলগুলো বের করে নিই! কোথায় গাছটা?'

'বেশি দূরে না,' রহস্যময় হাসি হেসে বলল হেনরি। 'তবে এর বেশি আর কিছু বলছি না। আগে পুরস্কারের ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হোক তারপর...'

'পুরস্কারের ফয়সালা একটাই,' রেগে গিয়ে বলল রবিন, 'আমরা নেব না। আপনিও পাচ্ছেন না। যেভাবে চাপাচাপি করছেন, এখন তো আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই চুরিতে আপনারও হাত ছিল কিনা!'

'কি বললে!' গর্জে উঠল হেনরি। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' খানিক আগের নম্রভাষী লোকটার আচরণ এখন আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই তার মাঝে, পুরোপুরি বদলে গেছে। খপ করে রবিনের শার্টের কলার চেপে ধরল। কিন্তু ঝাড়া দিয়ে কলারটা ছুটিয়ে নিয়েই দৌড় দিল রবিন। চেঁচাতে লাগল, 'এই, পালাও, সব পালাও! লোকটা ভাল না!'

ছয়

সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে অনিতা। ছেলেরা ভয় যতখানি পেয়েছে তারচেয়ে রেগেছে বেশি। গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটছে আলাদা আলাদা হয়ে। বনের ভিতর থেকে বেরোনোর আগে থামল না।

বেরিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা ঘাসের ওপর। কেউ চিত হয়ে, কেউ হাতের ওপর ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে হাঁপাতে লাগল।

'লোকটা...আমাদের...ধরতে...আসবে না তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অনিতা।

'মনে হয় না,' মুসা বলল। 'এখানে লোক চলাচল বেশি। এদিকে এসে শয়তানী করার সাহস পাবে না। আশ্চর্য! কে ভাবতে পেরেছিল, এভাবে হঠাৎ খেপে যাবে!'

'মেডেলগুলোর খোঁজ সত্যি কি জানে ও?' ববের প্রশ্ন।

'মনে হয় জানে। আর গর্তের মধ্যে যদি সত্যি সত্যি হাত ঢোকাতে না পেরে থাকে, তাহলে বাক্সটাও জায়াগমতই আছে এখনও। ওর হাতের থাবা দেখেছিস? বিরাট। পাখির গর্তে ঢুকবে না।'

'ওই চোরটার সঙ্গে তারও হাত রয়েছে, যা-ই বলো,' রবিন বলল। 'হেনরি ডেরিকই হোক, আর যে নামই হোক, ব্যাটা চোরের দলের লোক। পাখি দেখার নাম করে এদিকে ঘোরাঘুরি করে, লোকের ওপর চোখ রাখে, তারপর ছোট হাতওয়ালা কাউকে দিয়ে চুরিগুলো করায়। তার সাগরেদরাই হয়তো চোরের ওপর বাটপাড়ি করে কিছু কিছু মাল এমন জায়গায় সরিয়ে রাখে, যেগুলো আর সে হাতাতে পারে না। আস্ত শয়তান। ওর কথার কোন বিশ্বাস নেই।'

এখন কী করা?' অনিতা বলল। 'ভয় লাগছে। বাড়ি চলে যাই।'

'মিটিঙে বসতে হবে,' বব বলল। 'সবাইকে জানানো দরকার, বিশেষ করে কিশোরকে। আলোচনা করলেই একটা কিছু উপায় বেরিয়ে পড়বে। চলো।'

সোজা কিশোরদের বাড়িতে চলে এল ওরা। বাগানে ঢুকতেই মিশার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'মিশা, খবর আছে!' বলে উঠল রবিন। 'কিশোর কই? জরুরি মিটিং ডাকা

দরকার।'

'তিনটার আগে তো আসবে না,' মিশা জানাল, 'খালুর সাথে কোথায় জানি গেছে। এতই জরুরি? ঠিক আছে, এলে বলব। তোমাদেরকে টেলিফোন করবে।'

'না, ফোন করার দরকার নেই। তিনটে বাজলে আমরাই নাহয় চলে আসব। মিশা, জেনারেলের মেডেলগুলো কোথায়, শুনেছি আমরা।'

শুনে কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মিশার চোখ। 'বলো কি! কোথায়?'

রবিন জবাব দেয়ার আগেই দরজায় বেরিয়ে এলেন মেরিচাচি, কাজ করতে ডাকলেন। কাজেই শোনা আর হলো না। বলল, 'ঠিক আছে, তিনটেয় দেখা হবে।'

গেটের দিকে রওনা হলো আবার মুসারা।

যেতে যেতে রবিন বলল, 'তিনটেয় কিশোর ফিরলে হয়। যাকগে, চলি এখন। খুব টায়ারড্ লাগছে। অনেক ছোটাছুটি করলাম।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অনিতা। 'এখন শুধু ডলিকে জানানো বাকি। আমি ওকে জানিয়ে দেব। শুনে যা চমকে যাবে না।'

তিনটায় এসে আবার কিশোরদের বাগানে ঢুকল ওরা। ছাউনির দিকে এগোতেই দেখল দরজায় বসে আছে টিটু।

সাড়া পেয়েই দরজায় বেরিয়ে এল কিশোর, সঙ্কেত-ফঙ্কেতের ধার দিয়েও গেল না আজ। 'এসো, এসো, জলদি এসো! শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি। নিশ্চয় অনেক কিছু জেনেছ?'

'হ্যাঁ, জেনেছি,' রবিন জবাব দিল। 'কল্পনাই করতে পারবে না, কী জেনেছি। হায় হায়, আমার ব্যাজ ফেলে এসেছি...'

'বাদ দাও ব্যাজ!' হাত নেড়ে বলল কিশোর। 'জরুরি মিটিঙে ওসবের দরকার নেই।'

বাক্সের ওপর বসে পড়ল সবাই।

'হ্যাঁ, যা যা হয়েছে এবার বলে ফেলো,' কিশোর বলল। 'মিশার কাছে শুনলাম, মেডেলগুলোর খোঁজ নাকি পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' খবর জানাল। 'বদমাশ লোকটা যদি সত্যি বলে থাকে। ও বলল, রাতের বেলা একজনকে নাকি দেখেছে একটা চামড়ার বাক্স নিয়ে গিয়ে পাখির গর্তে ফেলতে। গর্তটা এত ছোট, সরু হাত ছাড়া ঢুকবে না। কাঠঠোকরার গর্ত।'

'তার মানে সরু হাতওয়ালা কেউই কেবল বের করতে পারবে,' কিশোর

অনুমান করল। 'যাক, এটা একটা খবর বটে। গাছটা দেখিয়েছে?'

'না,' বলল রবিন। 'শুধু এটুকু বলেছে, আমরা যেখানে বসে খেয়েছি তার থেকে বেশি দূরে না ওটা।'

'কিন্তু তাতে তেমন সুবিধে হবে না,' মাথা নাড়াল অনিতা। 'ডজন ডজন গাছ রয়েছে আশপাশে। ওগুলোর কোনটাতে রয়েছে একটা কাঠঠোকরার বাসা, যেটাতে মোটা হাত ঢোকে না। অনেক বাসা আছে, যেগুলোর গর্ত এত বড়, পুরো হাত ঢুকিয়ে দিলেও নিচটা নাগাল পাওয়া যায় না। ওরকম কোন গর্তে ফেলে থাকলে বের করাই মুশকিল।'

'হুঁ,' অনিতার কথায় একমত হয়ে বলল রবিন, 'ওই গর্ত খোঁজা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল। গর্তটা কোনদিনই খুঁজে পাব না আমরা।'

নীরব হয়ে গেল সবাই। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

'তা কারও কোন পরামর্শ আছে?' অবশেষে বলল কিশোর। 'সবাই মিলে ভাবনাচিন্তা করে কি কিছু বের করতে পারি না আমরা?'

মিশা বলল, 'একটা ব্যাপারে শিওর হতে পারি, ওই গর্ত থেকে হেনরি নিজে বাক্সটা বের করে নিতে পারবে না। সরু হাতওয়ালা কারও সাহায্য লাগবে। সেটা সে করতে যাবে না জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে। তারচেয়ে বরং গাছের কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবে চোরটার অপেক্ষায়। বের করার কোন একটা ব্যবস্থা করবেই চোরটা। আর বের করলেই গিয়ে ধরবে হেনরি। হয় ছিনিয়ে নিতে চাইবে, নইলে ভাগ চাইবে। আমরাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারি। কোন গাছ থেকে বের করার চেষ্টা করে চোর, দেখব। তারপর লেলিয়ে দেব টিটুকে...'

'ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে!' উত্তেজিত হয়ে বোনের কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। 'মিশা, খুব ভাল বুদ্ধি বের করেছ!'

'পুলিশকে জানিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'না, তা বোধহয় ঠিক হবে না। পুলিশকে জানাতে গেলেই পুরস্কারের ব্যাপারটা উঠে পড়বে। আর একবার যখন ঘোষণা করে ফেলেছেন জেনারেল, মেডেলগুলো পাওয়া গেলে সেটা তাঁকে দিতেই হবে। হয়তো পুলিশই টাকাটা নিয়ে কোন হাসপাতালে দান করে দেবে। আমরা চাই না বেচারা জেনারেলের পকেট থেকে অযথা এতগুলো টাকা খসে যাক।'

'তবে পুলিশকে দলে টানতে পারলে ভাল হত। ওদের ক্ষমতা অনেক বেশি। সেই তুলনায় আমরা কিছুই না।'

'টিটু যখন আমাদের সঙ্গে থাকছে,' ডলি বলল, 'অত ভয় পাই না।'

'হুফ!' বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল টিটু, মাটিতে বাড়ি মারল লেজ দিয়ে।

'কে কে যাবে, সেটা ঠিক করে ফেলা দরকার এখন,' কিশোর বলল।

দেখা গেল সবাই যেতে চায়।

'সেটা সম্ভব না,' কিশোর বলল। 'এত লোক গেলে লুকিয়ে থাকতে পারব না। শব্দ করে ফেলব। তাতে চোরটার নজরে পড়ে যেতে পারি।'

এরপর অনেক আলোচনা, অনেক তর্কাতর্কি চলল। শেষে কিশোর বলল, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমরা আপাতত কাউকে বলছি না। রাতে এখানে এসে দেখা করবে। গরম কাপড় নেবে, ঠাণ্ডা পড়তে পারে। টর্চ তো অবশ্যই নেবে। দেখে নেবে ব্যাটারি তাজা কিনা। হঠাৎ নিভে গিয়ে অন্ধকারে বিপদে পড়তে চাই না।'

'চাঁদ থাকবে,' মনে করিয়ে দিল ডলি। 'অতটা অন্ধকার বোধহয় হবে না।'

'বনের ভিতর আলোও থাকবে না তেমন,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া মেঘ করতে পারে, চাঁদ ঢেকে যেতে পারে। ঝুঁকি নিতে যাব কেন? তারচেয়ে ব্যাটারি চেক করে নেয়াই ভাল। বনের ভিতরে ঢুকে চুপ হয়ে যেতে হবে আমাদের। নেহায়েত দরকার না পড়লে কথা বলব না। আর বলতে হলে ফিসফিস করে, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে বলল সদস্যেরা, যেন এখনই বনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে।

'সবাই আমরা লুকিয়ে থাকব,' কিশোর বলল। 'কেউ গাছের ডালে, কেউ ঝোপের ভিতরে। আবার বলছি কোন শব্দ করা চলবে না। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, আবারও বলল সবাই।

মেয়েরা বেশি উত্তেজিত। কারণ এ-রকম অভিযানে ওরা কমই যায়, নেয়া হয় না ওদেরকে, এ-সব কাজ সাধারণত দলের ছেলেরাই করে।

'টিটু থাকবে আমার কাছে,' কিশোর বলল। 'চোরটা এলে কোন গাছটার কাছে যায় দেখব, তারপরই দেব টিটুকে ছেড়ে। লোকটাকে ভয় দেখিয়ে টিটু তাড়িয়ে দেয়ার পর গর্ত থেকে বাক্স বের করার চেষ্টা করব আমরা।'

'দারুণ মজা হবে!' উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে অনিতার। 'তবে ভয়ও করছে!'

'না, ভয়ের তেমন কিছু নেই, যদি যেভাবে বললাম সেভাবে কাজ করতে পারো। যদি ভয় পেয়েই যাও কেউ, চুপ থাকবে, আড়াল থেকে বেরোবে না, তাহলেই কোন চিন্তা নেই। আর যাই করো, বোকামি করে সব কিছু ভণ্ডুল কোরো না। এখন তাহলে এ-পর্যন্তই। সময়মত চলে আসবে। কেউ দেরি করলে তাকে

ফেলেই চলে যাব আমরা।'

সবাই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, দেরি তো করবেই না, বরং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চলে আসবে। আজকের এই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ মিস করতে রাজি নয় কেউ।

'ইস, যদি খালি মেডেলগুলো খুঁজে বের করতে পারতাম!' একা একা বাড়ি ফেরার সময় আপনমনেই বলল রবিন। 'নিয়ে যেতে পারতাম জেনারেলের কাছে! কী যে খুশি হতেন তিনি! তাঁর সেই হাসিমুখ দেখতে পারলে দুনিয়ার আর কিছুই চাইব না আমি।'

সাত

মুসাকে টর্চে নতুন ব্যাটারি ভরতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল বাবলি। জিজ্ঞেস করল, 'রাতে বাইরে যাচ্ছিস নাকি? কোথায়?'

'যেখানেই যাই, তাতে তোর কি?' ধমক দিয়ে বলল মুসা। 'দূর হ এখান থেকে!'

'দলের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিস তুই,' একচুল সরল না বাবলি। 'বল না, কোথায় যাচ্ছিস?'

'সর!'

'তাহলে সত্যিই যাচ্ছিস কোথাও!'

'ভাগ্যিস মেয়ে হয়ে জন্মেছিস। নইলে এমন মার দিতাম এখন, দাদার নাম ভুলিয়ে ছাড়তাম! যা ভাগ!'

'যাচ্ছি,' খোঁচা দিয়ে বলল বাবলি, 'তবে তোর পিছু না নিয়ে ছাড়ব না। আমি আর নিনা দুজনেই যাব।'

ভয় পেয়ে গেল মুসা। গলার স্বর একটু নরম করে বলল, 'বললাম তো, তেমন কোথাও যাচ্ছি না। মীটিং আছে আমাদের। এখন যা।'

'না, যাব না,' বাবলি বলল। 'আগে বল আমাকে সব কথা।'

জবাব না দিয়ে সরে এল মুসা। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাবলিটাকে নিয়ে আর পারা যায় না! এত ছোঁক ছোঁক করলে চলে কিভাবে! আশ্চর্য, কী করে জানি গন্ধ পেয়ে যায়! ওরই মত আরেক শয়তান, নিনাকে নি-

পিছু নেবে! নাহ্, কী করে যে খসাবে ও-দুটোকে লেজ থেকে…

সে-বিকেলে সবাই যার যার চার্ট পরীক্ষা করে নিল। কিশোরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। টিটু বুঝতে পারছে না, কিশোর আর মিশা এত অস্থির কেন। আসলে ও তো জানে না, ওদের দুজনের সময় কাটতে চাইছে না, অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে, কখন সন্ধ্যা হবে, রাত নামবে…

'টিটু, শোন,' একসময় কিশোর বলল, 'তোকে যা যা করতে বলা হবে ঠিক তা-ই করবি। একটা লোককে পাকড়াও করতে হতে পারে। শুধু আটকে রাখবি, কামড়াবি না কিন্তু, খবরদার। আর আমি বলার আগে টুঁ শব্দটি করবি না, বুঝেছিস?'

কি বুঝল টিটু কে জানে, শুধু বলল, 'হুফ!'

সময় যেন থেমে গেছে লধশদের সবার জন্যেই। কাটতেই চাইছে না। আজ কি আর অন্ধকার হবে না! হলো। তবে তার আগেই ঘন মেঘে ঢাকা পড়ল আকাশ। ফলে ধীরে ধীরে নয়, রাত নেমে এল আচমকা।

খাবার সময় কিশোর আর মিশাকে অন্যমনস্ক আর অস্থির দেখে অবাক হলেন মেরিচাচি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, তোদের শরীর খারাপ নাকি?'

'না তো! কেন?' সতর্ক হয়ে গেল কিশোর। 'না শরীর খারাপ না। এমনি, একটা কথা চিন্তা করছি। একটা জরুরী মীটিঙে বসব। তুমি আর চাচা তো বাইরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। ফিরতে দেরি হতে পারে। তোরা বেশি রাত করিস না কিন্তু। সকাল সকাল শুয়ে পড়িস।'

মনে মনে হাঁপ ছাড়ল কিশোর। চাচা-চাচি বাইরে চলে গেলে ভালই হবে। রাতে ওদের বেরোনোর জন্যে আর কেনোরকম কৈফিয়ত দিতে হবে না।

অন্ধকার 'নামতেই নিঃশব্দে ছাউনির কাছে এসে হাজির হতে লাগল সদস্যারা। মাঝে মাঝে বাগানের পথে দেখা গেল তাদের টর্চের আলো।

'সবাই হাজির?' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'বেশ। চলো।'

দল বেঁধে রওনা হলো ওরা। টিটু চলল কিশোরের পায়ে পায়ে। খানিক পরে হঠাৎ করে মেঘ কেটে গেল চাঁদের ওপর থেকে, অন্ধকার দূর হয়ে গেল অনেকখানি। তবে উজ্জ্বল হতে পারছে না জ্যোৎস্না। বনের ভিতরে অন্ধকার বেশি, চাঁদের আলো তেমন ঢুকতে পারছে না যেখানে ঘন গাছপালা রয়েছে। গাছের গোড়ায় জমাট ছায়া।

'এই, কিসের শব্দ?' থমকে দাঁড়াল কিশোর। 'মট করে উঠল না! মরা ডালে

পা দিয়েছে কেউ।'

মুসাও থমকে গেল। বাবলি-নিনা নয় তো! কিন্তু ওকে তো বেরোতে দেখার কথা নয় বাবলির। আর কোন শব্দ শোনা গেল না। আবার চলতে লাগল দলটা।

অনিতার হাত ধরল ডলি। ভয় সে পায়নি, তবে অন্তত একজন বন্ধু যে তার খুব কাছাকাছি রয়েছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে চাইছে।

চলতে চলতে একবার এখানে শুঁকছে, একবার ওখানে শুঁকছে টিটু। রাতের বেলা দলের সঙ্গে বেরিয়ে বেশ ভাল লাগছে তার।

হেনরির সঙ্গে যে জায়গাটায় বসে খেয়েছিল মুসারা, সেই জায়গাটায় চলে এল।

'আশেপাশেই কোথাও রয়েছে গাছটা,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। লুকিয়ে পড়া দরকার। যার যেখানে খুশি লুকাও, তবে চুপচাপ থাকবে। ছড়িয়ে পড়ো। তাহলে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারব আমরা।'

অদৃশ্য হয়ে গেল লধশরা। এমনকি টিটুও গায়েব। গাছে উঠে পড়ল কিশোর আর মুসা। মিশা খুঁজে পেল ঘন একটা ছোপ। ভিতরে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে নজর রাখা যায়। বড় বড় পাতাওয়ালা একটা লতা-ঝাড়ের ভিতরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ডলি। আশা করল, কেউ তাকে মাড়িয়ে যাবে না। গেলে কী হবে সেকথা আর ভাবতে চাইল না সে। অনিতাও ঢুকল একটা ঝোপের ভিতর । 'ইচ্ছে করলে এখানে ঘুমোতেও পারি,' ভাবল সে। তবে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে, ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে।

পুরানো একটা ওক গাছের মস্ত ডালে চড়ে বসল রবিন আর বব। চিত হয়ে শুয়ে থাকা যায়, এত মোটা ডাল। তা-ই করল ওরা। ফিসফাস করে আলাপ জুড়ে দিল দুজনে। কিশোর যে গাছটায় চড়েছে, তার গোড়ায় লতাপাতার ভিতরে লুকিয়ে বসে রইল টিটু। কান খাড়া। মনিবের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ভাল, কিশোর ভাবল। খুব ভাল। তারমানে চোরটার নজরে পড়বে না ওরা কেউ।

কাছেই একটা গাছে পেঁচার কর্কশ চিৎকার চমকে দিল সবাইকে। সাথে সাথে গরগর করে উঠল টিটু, মৃদু ধমক দিয়ে তাকে থামাল কিশোর। চুপ হয়ে গেল টিটু। তবে কান খাড়া রেখেছে। ওভাবে হঠাৎ ডেকে উঠল কেন পাখিটা, বুঝতে পারছে না সে।

গর্ত থেকে বেরিয়ে অলস ভঙ্গিতে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল একটা

খরগোশ। আরেকটা বেরিয়ে এসে যোগ দিল ওটার সঙ্গে। নাচানাচি করে খেলতে শুরু করল। গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া চাঁদের আলো পড়েছে ওগুলোর গায়ে। এত কাছে দুটো খরগোশ নেচে বেড়াচ্ছে! অথচ কিছুই করতে পারছে না সে! ভীষণ বিরক্তিতে চোখ বন্ধ করল টিটু। সহ্য করাই মুশকিল।

গাছের মগডাল থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে এল একটা কাঠবিড়ালী। রবিন আর ববকে দেখে থেমে গেল। সতর্ক হয়ে উঠেছে। কেউ নড়ল না ওরা, পড়ে রইল মরার মত। অবশেষে কাঠবিড়ালীটা ভাবল, 'ওরা বিপদ' নয়, গাছেরই অংশ। লাফ দিয়ে এসে উঠল রবিনের পিঠে। সরে এল তার মুখের কাছে। নাকের কাছে নাক এনে শুঁকতে লাগল।

'এহ্হে, ওরকম করিসনে! সুড়সুড়ি লাগে,' বলল রবিন।

আর কী দাঁড়ায় ওটা। তিন লাফে পাতার আড়ালে উধাও।

প্রচণ্ড হাঁচি পেল মুসার। নাকের ভিতর সুড়সুড় করছে। চাপা দেয়ার জন্যে ঢোক গিলতে লাগল সে। কিন্তু ঠেকাতে পারল না। বাড়তে বাড়তে একেবারে বিস্ফোরণই ঘটিয়ে ছাড়ল যেন হাঁচিটা। এত জোরে 'হ্যাচ্চো' শুনে ভয় পেয়ে খেলা বাদ দিয়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে আবার গর্তে ঢুকল খরগোশ দুটো। ওদেরই বা দোষ কি। শব্দের কারণে চমকে গিয়ে আরেকটু হলে কিশোরই পড়ে যাচ্ছিল গাছ থেকে। 'এই কী করো!' হিসিঁয়ে উঠল সে। 'আর যেন না হয়! চাপতে পারো না?'

'অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'আমিও তো পড়ে যাচ্ছিলাম।...কিশোর, খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে আজ...'

'চুপ!' ওদের দেখাদেখি সবাই আলাপ শুরু করে দিতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি মুসাকে থামিয়ে দিল কিশোর।

স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ। তারপর বইতে আরম্ভ করল বাতাস। সড়সড় করে উঠল গাছের পাতা। ঝোপের ফাঁকফোকর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র শব্দ তুলল। ডলির মাথার কাছে এসে নিচু একটা ডালে বসে আবার ডেকে উঠল পেঁচাটা। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে একলাফে দাঁড়িয়ে গেল ডলি।

'দূর, বোকাগুলোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না!' রাগে বিড়বিড় করল কিশোর। ডেকে বলল, 'এই ডলি, বাড়ি চলে যাও। যাও!'

দুঃখে ক্ষোভে চোখে পানি এসে গেল ডলির। তার কী দোষ? হতচ্ছাড়া পেঁচাটার জন্যেই তো এ-রকম ঘটল! মরুক শয়তান পাখিটা! চুপচাপ আবার আগের মত শুয়ে পড়ল সে।

আবার নীরবতা। পেঁচাটা চলে গেছে। হাঁচি শুনে ভয় পেয়েছে, আর হুতুম

পেঁচার ডাক আতঙ্কিত করে দিয়েছে খরগোশকে, আর বেরোল না একটাও। আর কেউ হাঁচি দিল না। কাশলও না, তবে জোরে হাই তুলল কে যেন, আওয়াজ শোনা গেল।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' সাবধান করল কিশোর। 'কেউ আসছে!'

যে যেখানে রয়েছে, নিথর হয়ে গেল লধশরা। উত্তেজনায় বুকের ভিতরে দুরুদুরু করছে ওদের। ডলির মনে হচ্ছে, বোধহয় ওর বুকের খাঁচা ভেঙেই বেরিয়ে চলে আসবে হৃৎপিণ্ডটা, এত ধড়াস ধড়াস করছে।

হ্যাঁ। সত্যি কেউ আসছে। টিটু তো বটেই, ছেলেমেয়েরাও শুনতে পাচ্ছে মৃদু পায়ের শব্দ। পায়ের নিচে পড়ে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল। বার দুই গলা পরিষ্কার করল আগন্তুক। কে? চোরটা? না হেনরি ডেরিক? নাকি অন্য কেউ, চাঁদনী রাতে বনের ভিতর হাঁটতে এসেছে?

হেনরি ডেরিক! ওই তো, চাঁদের আলোয় চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। মেডেল খুঁজতে এল নাকি? মনে হয় না। কারণ গর্তের ভিতরে ঢুকবে না তার বিশাল থাবা। চোরটার জন্যে অপেক্ষা করবে। মেডেলগুলো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।

নরম গলায় শিস দিতে দিতে এগোল হেনরি। এত কাছ দিয়ে গেল যে ডলির ভয় হলো তাকে না মাড়িয়েই দেয়! কিছুদূর এগিয়েই থেমে গেল লোকটা। না, লধশদের খুঁজছে না নিশ্চয়ই। তার জানার কথা নয় যে ওরা এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

'চোরটাকে ধরতেই এসেছে সে,' কিশোর ভাবল। আস্তে করে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ডালের নিচে। 'কোথাও লুকিয়ে থেকে নজর রাখছে গাছটার ওপর, যে গাছের গর্তে রয়েছে বাক্সটা। ওরাও খানিক পরেই জানতে পারবে, কোন গাছের গর্তে ওটা লুকিয়েছে চোর। এখন টিটু বা অন্য কেউ কিছু না করে বসলেই হয়!' মনে মনে প্রার্থনা করল সে, 'খোদা, দয়া করে ওদেরকে চুপ করিয়ে রাখো!'

আট

মোটা একটা ওক গাছের কাছে গিয়ে তার আড়ালে লুকাল হেনরি। কল্পনাই করল না, মাথার ওপরই রয়েছে বব আর রবিন।

নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে দুজনে, হেনরি যদি শুনে ফেলে? একটু দূরেই

মাটিতে পেট ঠেকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে টিটু। সবাই নীরব। টু শব্দ করছে না। উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে। কী ঘটে! কী ঘটে!

ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। টিটু নয়। অন্য কুকুর। বোধহয় চোরটা নিয়ে আসছে। হয়তো টের পেয়েছে কোনভাবে, হেনরি ডেরিক অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

আবার মৃদু শিস শোনা গেল। জ্যোৎস্নায় আলোকিত ঘাসে ঢাকা এক চিলতে জমিতে বেরিয়ে এল কেউ, পিছনে একটা বিশাল কুকুর। ডলির কাছ থেকে বেশি দূরে নয় ওরা।

'সর্বনাশ, অ্যালসেশিয়ান!' কিশোর ভাবল। 'টিটুর গন্ধ না.পেলেই হয় এখন!'

হঠাৎ গোঁ গোঁ করে উঠল কুকুরটা। তাহলে কি টিটুর গন্ধ পেয়েই গেল? নাকি লধশদের কারও?

'এই ডোবার, চুপ!' ধমক লাগাল লোকটা। 'এখানে কেউ নেই। নিশ্চয় খরগোশের গন্ধ পেয়েছিস।'

জমিটুকু পেরিয়ে কয়েকটা বড় গাছের জটলার দিকে এগোল লোকটা। ডোবার চলল তার পিছনে। কিন্তু ঘড়ঘড় বন্ধ হলো না। দেখা গেল, চুপিসাড়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে হেনরি। দাঁড়িয়ে গেল ডোবার। সেদিকে ফিরে ঘড়ঘড় করে উঠল জোরে জোরে।

চেঁচিয়ে বলল হেনরি, 'নিক, আমি। মেডেলগুলো বের করো, তারপর কথা আছে। একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমরা।'

'না, আমি সেটা করছি না,' হেসে উঠল নিক। 'তুমি যে আসবে এটা আগেই সন্দেহ করেছি, সে-জন্যেই ডোবারকে নিয়ে এসেছি। তেড়িবেড়ি করলেই দেব লেলিয়ে। যাও, ভাগো।'

'ডোবার আমাকে চেনে, কিছু করবে না। বের করো ওগুলো।'

'পারলে নিজেই এসে বের করে নাও। সিক আনিনি। বাক্স বের করার ইচ্ছে নেই আজ। এসেছি শুধু দেখতে তুমি আসো কিনা। তা এত ভাবনা কিসের? আছে তো এখানেই, এই গাছটার গর্তে। দেখ এসে, তোমার ভালুকের মত থাবা ঢোকে কিনা।'

'ঢোকে যে না সেটা ভাল করেই জানো,' রেগে গেল হেনরি। 'আমার সঙ্গে বেঈমানী! আমাকে ফাঁকি দেবে। সেটি হচ্ছে না। এখন ভাল চাও তো, সিক নিয়ে এসো গে। বের করো ওগুলো দাও আমার হাতে। নইলে...'

হেনরিকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল নিক।

রাগে জ্বলে উঠল হেনরি। চোখের পলকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিকের ওপর। ঘুসি মেরে তোকে ফেলে দিল মাটিতে।

তবে সে-ও খাড়া থাকতে পারল না। উড়ে এসে তার ওপর পড়ল, বাঘের মত কুকুরটা। হেনরিকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

লধশ া সবাই দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে, উত্তেজনায় কাঁপছে ওদের বুক। মজা পাচ্ছে শুধু া টু। অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে নিজেকে। তারও প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে বিশাল কুকুরটাকে সাহায্য করে।

বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না টিটু। চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে।

ঝট করে মাথা তুলল অ্যালসেশিয়ান। মুখ ফেরাল এদিকে। এই সুযোগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হেনরি।

চেঁচিয়ে আদেশ দিল নিক, 'ডোবার, জলদি ধরো ওই কুত্তাটাকে!'

ছুটে এল অ্যালসেশিয়ান। টিটু ভাবল, তার সঙ্গে খেলা করতে আসছে। আড়াল থেকে বেরিয়ে সে-ও ছুটল ওটার দিকে।

পাগলের মত গাছ বেয়ে নামতে শুরু করল কিশোর। মুসাও নামছে। দুজনেই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। কামড়ে ফালা ফালা করে দেবে টিটুকে! চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'টিটু সর! সর, টিটু, সর!'

গাছ থেকে হঠাৎ দুটো ছেলেকে সামনে পড়তে দেখে অবাক হয়ে গেল অ্যালসেশিয়ান। হেনরি আর নিক যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রথমে একটা কুকুর, তারপর দুটো ছেলে...হতচ্ছাড়া এই বনভূমিতে ঘটছে কী আজ রাতে!

টিটু তখনও বিপদ বুঝতে পারেনি। খুশিমনে অ্যালসেশিয়ানটাকে ঘিরে নাচতে আরম্ভ করল। লোক দুটো এসে দাঁড়াল মুসা ও কিশোরের কাছে। কিশোরের কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল হেনরি, 'এই ছেলে, এখানে কী করছ? গুপ্তচরগিরি, না? কুকুরটাকে দিয়ে যখন কামড় খাওয়াব, তখন বুঝবে মজা।'

'ছাড়ুন!' রেগে গেল কিশোর। 'হ্যাঁ, গুপ্তচরগিরিই করতে এসেছি, তাতে হয়েছে কি? আজ সকালে আমার বন্ধুদের বলেছিলেন, মেডেলগুলো কোথায় লুকানো আছে জানেন। সেটাই দেখতে এসেছি, কোত্থেকে কিভাবে খুঁজে বের করে আপনার দোস্ত। এখন বুঝতে পারছি, সিকের মাথায় আংটা লাগিয়ে সেরাতে জেনারেলের ঘরের জানালার ছিটকানি খুলেছিল সে।'

'এখুনি থানায় যাচ্ছি আমরা,' হুমকি দিল মুসা। 'পুলিশ এসে আপনাদের দুজনকেই ধরবে।'

পরোয়াই করল না হেনরি। কিশোরের হাতটা টেনে নিয়ে চোখের সামনে এনে দেখল, তারপর বলল, 'এসো! গর্ত থেকে বাক্সটা বের করবে। হাত ছোটই আছে, সিক-টিকের দরকার হবে না, গর্তে ঢুকবে মনে হচ্ছে। এসো।'

কিশোরকে গাছের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে। টিটু রেগে গেল। আর রেগে গেলে সাধারণত যা করে তা-ই করে বসল। লাফ দিয়ে গিয়ে কামড় বসানোর চেষ্টা করল হেনরির পায়ে। লাথি মেরে তাকে সরিয়ে দিল হেনরি। ব্যথা পেয়ে কেঁউ কেঁউ করে উঠল টিটু।

চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ওকে মারছেন কেন! ও কী আপনার সমান! বাচ্চা তো, তাই পারলেন…ওর বাপের গায়ে খালি হাত ছুঁইয়ে দেখতেন, টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলত!'

কিশোরের কথা কানেই নিল না লোকটা। আবার লাথি মারতে গেল টিটুকে। আর সহ্য হলো না মিশার। কাছের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে এল। 'টিটু, টিটু, সরে আয়! শয়তান লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়!'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার অবাক হওয়ার পালা হেনরি আর নিকের।

'আরেকটা বেরোল!' বিড়বিড় করল হেনরি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'এই, আর ক'জন আছে?'

আর লুকিয়ে থাকার কোন মানে নেই। দুই চোরকে আরও তাজ্জব করে দিয়ে সবাই একে একে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

'কাণ্ড দেখো!' নিক বলল। 'করছে কী এখানে…'

'আজ সকালে এগুলোর সাথেই দেখা হয়েছিল আমার,' গুঙিয়ে উঠল হেনরি। 'কি জানি একটা বিদঘুটে নামওয়ালা ক্লাব করেছে। নিক, এখনও সময় আছে। বাক্সটা বের করে আনো। নিয়ে চলে যাই।'

'না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'বেশ, তাহলে এই ছেলেটাকে দিয়েই বের করাচ্ছি,' হেনরি বলল। হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে কিশোরকে নিয়ে চলল অনেক পুরানো বড় একটা গাছের দিকে। গোড়া থেকে কিছুটা উপরে একটা গর্ত। গর্তের মুখে টর্চের আলো ফেলে তার ভিতরে কিশোরের হাতটা জোর করে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে।

'উহ্, ছাড়ুন, ছাড়ুন!' আর্তনাদ করে উঠলো কিশোর। 'ঢুকবে না, আমার হাত ঢুকবে না! চামড়া ছিলে যাচ্ছে…উহ্!'

কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে আচমকা পাশে এসে দাঁড়ানো ডলির হাত চেপে ধরল হেনরি। পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটার হাত ঢুকবে। খুব সরু আর ছোট।'

'আশ্চর্য! মেরে ফেলবেন নাকি!' কড়া গলায় বলল কিশোর। 'দেখছেন না কী রকম ভয় পাচ্ছে? ছেড়ে দিন! জোর করে ঢোকাতে পারবেন?'

ছাড়ল না হেনরি। জোর করে ডলির হাতটা নিয়ে গেল গর্তের মুখে।

'ওভাবে জোরাজুরি করলে লাভ হবে না,' কাঁপা গলায় বলল ডলি। 'আপনি সরুন, দেখি আমি নিজে নিজে চেষ্টা করে।'

এক মুহূর্ত ভাবল হেনরি। 'বেশ, সরছি। দেখো চেষ্টা করে। সাবধান, কোন চালাকি চলবে না।'

'আমি ওকে সাহায্য করছি,' বলে ডলির পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। চট করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল, হেনরি কতটা সরেছে। ডলির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বের করেই অমার হাতে দিয়ে দেবে…'

'এই, কী বলছ!' পিছন থেকে ধমক লাগাল হেনরি।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। যা বলার বলে ফেলেছে।

গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিল ডলি। আঙুলের মাথায় লাগল বাক্সটা। দুআঙুলে চেপে ধরে আস্তে বের করে আনতে আনতে বলল, 'এই, টর্চ নেভান! চোখে লাগছে তো! কানা করে দেবেন ন্যাকি?'

টর্চ নিভিয়ে দিল হেনরি। দুজনের অনেক পিছনে রয়েছে।

বাক্সটা বের করে হেনরির অলক্ষ্যে কিশোরের হাতে তুলে দিল ডলি। দ্রুত বাক্সের ডালা খুলে ভিতরের জিনিসগুলো পকেটে ভরে ফেলল কিশোর। আবার বন্ধ করল বাক্সের ডালা। তারপর আবার গর্তে ফেলে দিল বাক্সটা। অন্ধকারে এ-সব কিছুই চোখে পড়ল না হেনরির। জোরে জোরে ডলিকে বলল কিশোর, 'কি হলো, বের করতে পারছ না?…আরেকটু ভিতরে ঢোকাও হাত।…হাতে লেগেছে? হ্যাঁ, বের করে আনো এবার। তাড়াহুড়ো করবে না, তাহলে ছুটে যেতে পারে…বের করেছ? গুড।'

দুই লাফে ওদের পাশে চলে এল হেনরি আর নিক। থাবা দিয়ে ডলির হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিল হেনরি। তাকে ভাগ না দিলে কী কি করবে ওসব। শেষে একটা রফা হলো দুজনের মধ্যে।

খোদা, বাক্সটা যেন না খোলে ওরা!—মনে মনে বলল কিশোর।

খুলল না হেনরি। পকেটে ভরে ফেলল। যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই তার হাত চেপে ধরল নিক, 'দাঁড়াও! ছেলেমেয়েগুলোকে কী করব? ছেড়ে দিলে পুলিশকে গিয়ে সব বলে দেবে।'

'ভাল কথা মনে করেছ। কিন্তু কী করি? দড়িও তো নেই, বাঁধতে পারব না।'

'ডোবারকে পাহারায় রেখে যেতে পারি। কেউ পালানোর চেষ্টা করলেই কামড়ে দেবে। ওকে বলে যাব যাতে সকাল পর্যন্ত আটকে রাখে। ততক্ষণে অনেক দূর চলে যেতে পারব আমরা।'

'ঠিক আছে। বলো তাহলে।'

'ডোবার, থাক এখানে,' আদেশ দিল নিক। 'সারারাত পাহারা দিবি, বুঝলি? সারারাত।'

'দেখুন, কাজটা ভাল করছেন না,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল কিশোর।

কিন্তু পাত্তাই দিল না নিক। ফ্যাকফ্যাক করে হাসল। ডোবারকে ছেলেমেয়েদের পাহারায় রেখে রওনা হয়ে গেল দুজনে।

একটা গাছের গোড়ায় বসেছে লধশরা। চারপাশে একপাক ঘুরে এসে ওদের সামনে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল ডোবার। তবে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কেউ পালাতে চাইলেই লাফ দিয়ে গিয়ে পড়বে তার ঘাড়ে।

'মরলাম!' রবিন বলল। 'বাড়ি ফিরতে দেরি হলে অস্থির হয়ে যাবে মা, বাবাকে বলবে। খুব চিন্তা করবে। বাবা-মাকে সারারাত ভাবনায় রেখে এখানে বসে থাকতে পারব না আমি।'

উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই একলাফে কাছে চলে এল ডোবার। রবিনের কোটের হাতা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে এল আবার আগের জায়গায়।

'লাভ নেই, রবিন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওকে এ-সব কাজ করার জন্যে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। প্রথমে ধরে নিয়ে আসবে। বেশি বাড়াবাড়ি যদি করি, কামড়ে দেবে।'

'থাকলামই নাহয় কিছুক্ষণ আটকে,' হেসে বলল ডলি। 'মেডেলগুলো পেয়ে গেছি। কিশোরের পকেটে আছে। খালি বাক্স নিয়ে গেছে লোকগুলো'।

'কি বলছ?' কিছুই বুঝতে পারল না মিশা।

পকেট থেকে একটা মেডেল বের করে দুলিয়ে দুলিয়ে দেখাল কিশোর।

চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ধাতব গোল জিনিসটা। সোনার, বুঝতে অসুবিধে হলো না। বুঝল ওরা, এ-কারণেই চুরি হয়েছে জিনিসগুলো। হাসতে হাসতে সব কথা খুলে বলল কিশোর।

শুনে অন্যেরাও হাসতে লাগল। চোর দুটোকে মস্ত ফাঁকি দেয়া গেছে। মন অনেকটা হালকা হলো ওদের। তবে সারারাত বনের মধ্যে বসে থাকা যে সহজ ব্যাপার নয়, বুঝতে পারল খানিক পরেই। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে চাঁদ। গাছের গোড়ায় এখন ঘন কালো ছায়া। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে দ্রুত। শীত করছে ওদের। ভোর রাতে বেশি কষ্ট পাবে। ঠাণ্ডায়।

কিন্তু কিছু করার নেই। ডোবারকে ফাঁকি দিয়ে সরা যাবে না এখান থেকে।

নয়

পালানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে যতটা সম্ভব আরাম করে বসল ওরা। কিশোর আর মিশার মাঝখানে শুয়ে পড়ল টিটু। তার গায়ের উত্তাপ লাগছে ওদের গায়ে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকখানি স্বস্তি। সাপের মত বুকে হেঁটে নিঃশব্দে আসছে যেন রাতের হিমশীতল বাতাস, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করছে।

'ইস্, সাংঘাতিক শীত লাগছে,' পেটের ওপর হাত চেপে রেখেছে ডলি। 'একটা কম্বল যদি পেতাম...'

'গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসো সবাই,' পরামর্শ দিল রবিন। 'শীত কিছুটা কম লাগবে। মেয়েরা, তোমরা মাঝখানে বসো। আমরা দুপাশে থাকছি।'

দ্রুত সরে বসল ওরা। টিটুর মাথা কোলের ওপর রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখল কিশোর, অনেক আরাম লাগল তাতে। 'দাঁড়াও, পালা করে সবার কাছেই একবার করে পাঠাব,' বলল সে। 'সবাইকেই গরম বিতরণ করবে।'

ওরা যে এত সব করছে দেখেও যেন দেখল না অ্যালসেশিয়ানটা। ওদের দিকে পিছন করে রয়েছে, যেন তার মনিব নিকের ফেরার পথ চেয়ে। তবে ছেলেমেয়েরা সন্দেহজনক কিছু করলেই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে যাচ্ছে তার কান, তেমন বুঝলে ফিরে তাকিয়ে দেখছে কী করছে 'আসামীরা'। গরগর করে ধমকও দিচ্ছে। আরও আরাম করে বসার জন্যে উঠে দাঁড়াল কিশোর, সামান্য সরল

একপাশে, ইচ্ছে করেই একটু বেশি সরল। ব্যস, সাথে সাথে এদিকে ঘুরে গেল কুকুরটার মাথা, চাপা ঘড়ঘড়ানি বেরিয়ে এল গলার গভীর থেকে। তবু কিশোর বসছে না দেখে দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল। বসে পড়তে বাধ্য হলো কিশোর।

'আরে, ব্যাটা,' ধমক দিয়ে বলল রবিন,' একটু ঘুমোতেও পারিস না? ঘুম না এলে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাক মরার মত।'

কিন্তু কোন কথাই শুনল না ডোবার। যেমন ছিল তেমনি রইল। মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলো না। টিটুর কোন মাথা ব্যথা নেই তাতে। সে বুঝতে পারছে, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তবে এ-ব্যাপারে তার কিছু করারও নেই। কিশোরের কোলে মাথা রেখে আরামে চোখ মুদল সে। একটু পরেই খুলে ফেলল আবার। নাক তুলে বাতাস শুঁকল। গর্ত থেকে বেরোনো খরগোশের গন্ধ পেয়েছে বোধহয়।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বলল, 'ইস্, কখন যে সকাল হবে! বহু দেরি এখনও। অ্যালসেশিয়ানটা আমাদের ছাড়তে ছাড়তে অনেক দূরে চলে যাবে চোরগুলো।'

'তবে,' ডলি বলল, 'যখন বাক্সটা খুলে দেখবে খালি, পেঁচার মত করে ফেলবে মুখ। ওদের মুখটা যদি তখন দেখতে পারতাম!'

'বেশি তাড়াতাড়ি দেখলে মুশকিল হবে,' মিশা বলল। 'ফিরে আসবে আবার। আমাদের কাছে আছে কিনা দেখার জন্যে।'

'তাই তো!' অস্বস্তি ফুটল কিশোরের কণ্ঠে। 'এ কথাটা তো ভাবিনি। টিটু, কান খাড়া রাখ। ওদের সাড়া পেলেই বলবি।'

'হুঁফ্!' বলেই উঠে বসল টিটু। কাজ পেয়ে গেছে। আর আলসেমি করার মানে হয় না।

আধঘণ্টা পেরোল। মনে হলো যেন অর্ধেকটা বছর পেরিয়েছে। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে ডলি। সে এত কাঁপছে, সবাই রসিকতা করল, তার গায়ের কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে ওদের গায়েও।

'ভাগ্যিস গরম কাপড় এনেছিলাম,' অনিতা বলল। 'নইলে আজ জমেই যেতাম।'

'জমার আর বাকিটা আছে কী?' গলার স্কার্ফটা খুলে নিয়ে পায়ে পেঁচাতে লাগল মিশা। 'পায়ে আর সাড় নেই।'

হঠাৎ উঠে বসল ডোবার। পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেল তার কান। সতর্ক হয়ে

উঠেছে টিটুও।

'নিশ্চয় কিছু শুনেছে,' কুকুরগুলোর পরিবর্তন দেখে রবিন বলল।

গরগর করে উঠল ডোবার। তবে টিটু শান্ত রইল, যদিও শব্দটা শুনেছে।

রবিন বলল, 'সাইকেলের ঘণ্টা শুনলাম মনে হলো? অবাক কাণ্ড! এই রাতের বেলা সাইকেল নিয়ে কে আসছে এখানে?'

আবার গরগর করে উঠে ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে তাকাল ডোবার। যেন হুঁশিয়ার করল, খবরদার, কোন চালাকি নয়। একদম চুপ!

টিটুও কোঁ কোঁ করে উঠল। ব্যাপারটা কি? গরগর করার বদলে এ-রকম করছে কেন?

আবার শোনা গেল সাইকেলের ঘণ্টা। আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল লধশরা।

'এই, চেঁচাও, আরও জোরে চেঁচাও,' কিশোর বলল। 'লোকটার কানে গেলে নিশ্চয় দেখতে আসবে।'

'কিন্তু তাতে লাভটা কী হবে?' ডলি প্রশ্ন তুলল। 'অ্যালসেশিয়ানের খপ্পর থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। উল্টো নিজেই আটকা পড়বে। ওকে কী আর ছেড়ে দেবে কুত্তাটা?'

'মনে হয় না,' স্বীকার করল কিশোর। 'বরং কামড়ে দিতে পারে। যা হারামী কুত্তা!'

আবার নিরাশ হয়ে গেল সবাই। তবে কান পেতে রেখেছে, সাইকেল চালক কোনদিকে যায় শোনার জন্যে। আবার শোনা গেল ঘণ্টা। এবার দুটো। তারমানে লোক একজন নয়, একাধিক। বেশি লোক হলে ঠেকাতে পারবে না কুকুরটা।

আরেকটু পর শোনা গেল কণ্ঠস্বর। বয়স্ক নয়, ছোট মানুষের। আরও অবাক হলো লধশরা। রাতের বেলা এই হিমের মধ্যে সাইকেল নিয়ে ব্র্যামলি উডসের মত জায়গায় কারা এল!

হঠাৎ চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'বাবলির গলা! নিশ্চয় নিনাও রয়েছে সঙ্গে!'

'এখানে কেন এসেছে?' কিশোরও অবাক।

'বাবলি সন্দেহ করেছে, আজ রাতে মজার কিছু করতে বেরিয়েছি আমরা...আরে এই কুত্তা, অমন করছিস কেন?' ডোবারের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'ঠিক আছে বাবা, বসছি, এই বসলাম, আর দাঁত খিচানোর দরকার নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' কিশোরকে বলল সে, 'মীটিঙের আলোচনার বিষয় লিখে

রেখেছিলাম নোটবুকে। আজ রাতে ব্র্যামলি উডসে যে আসছি, তা-ও লিখেছি। নিশ্চয় নোটবুকটা খুঁজে বের করে দেখে ফেলেছে। ওই শয়তানটার জ্বালায় কোন জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি না...'

'পেয়েছে, ভালই হয়েছে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'অন্তত এই একটিবার ওদের আসতে শুনে খুশিই লাগছে। আসতে দাও। বাবলির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকো।'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। বনের গাছে গাছে প্রতিধ্বনিত হলো: বাবলি-ই-ই-ই-ই!

এই হঠাৎ চেঁচামেচিতে অবাক হলো ডোবার। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দ্বিধায় পড়ে গেছে যেন, কী করবে বুঝতে পারছে না। এমন কিছু করছে না ওর বন্দিরা, যাতে ব্যবস্থা নেয়ার দরকার হয়। শুধুই চেঁচাচ্ছে। জায়গা ছেড়ে উঠছে না, পালানোর চেষ্টা করছে না...তবু জোর গলায় ওদেরকে একটা ধমক লাগিয়ে, আবার সামনের দিকে পা বিছিয়ে তার ওপর থুতনি রেখে শুয়ে পড়ল সে।

বাবলি আর নিনাই। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন ওদের গলা।

আরেকবার ডাকল মুসা।

সাড়া দিল বাবলি, 'আসছি! কোথায় তোরা?'

'এই যে, এখানে!'

'এগিয়ে আয়! আসতে না পারলে টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দেখা।'

'বাবলি, একটা অ্যালসেশিয়ান আমাদের পাহারা দিচ্ছে। সাবধান! বেশি কাছে আসবি না।'

গাছপালার ফাঁকে দুটো সাইকেলের আলো দেখা গেল, যেন কোন অজানা দানবের চোখ। গোল, উজ্জ্বল। আবার উঠে দাঁড়াল ডোবার। আলোগুলোর দিকে চেয়ে গরগর শুরু করল। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। বাবলি আর নিনার জন্যে শঙ্কিত হলো মুসা।

'এই, বেশি কাছে আসবি না!' চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল সে। 'কুত্তাটা ভীষণ পাজি! শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? নেমে পড় সাইকেল থাকে।'

নেমে পড়ল বাবলি। তার হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। আলো এসে পড়ল বন্দিদের গায়ে। 'বা-বা, কী মজা!' টিটকারি দিয়ে বলল বাবলি। 'লধশ মিয়াদের অবস্থা দেখছি কাহিল! তা শীত লাগছে কেমন? জমে বরফ হয়েছ?'

নিনাও নেমেছে। দুজনেই সাইকেল নিয়ে ঠেলে এগোল। আর সহ্য করল না

ডোবার। গর্জে উঠে দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে গেল ওদের দিকে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল নিনা। দিশেহারা হয়ে পড়ল।

'চুপ!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।' একদম চুপ করে থাকো। একটুও নড়বে না। দৌড় দিলে মরবে।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাবলি জিজ্ঞেস করল, 'কুত্তাটা তোমাদের আটকে রেখেছে কেন?'

'সেকথা এখন তোকে বলা যাবে না,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'তবে ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য করতে পারিস। পুলিশকে গিয়ে আমাদের খবর জানাতে পারিস। যা দেখে গেলি বলবি ওদেরকে গিয়ে। তোদের শয়তানীটা এবার আমাদের উপকারেই লাগল মনে হচ্ছে।'

'কথার ছিরি দেখো না...,' নিজের অজান্তেই সাইকেল ঠেলে এগোতে যাচ্ছিল নিনা, ডোবারের ধমক খেয়ে থেমে গেল।

বাবলি বলল, 'যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। একটুও ভাবিস না,' ভাইকে আশ্বস্ত করল সে।

'আমরা যতটা ভাবি আসলে ততটা খারাপ না বাবলি,' যাকে দুচোখে দেখতে পারে না, তার প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠল রবিন। 'একআধটু দুষ্টুমি করে বটে মাঝেসাঝে, তবে মনটা খুবই ভাল।'

কোন মন্তব্য করল না মুসা। শুধু বলল, 'পুলিশ নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে পারলেই হয় এখন!'

নিনা আর বাবলির উত্তেজিত কণ্ঠ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। একবার কী দুবার শুনতে পেল সাইকেলের ঘন্টা। তারপর আবার সব আগের মত চুপচাপ। বার দুই আহ্লাদী গলায় কুঁই কুঁই করে কিশোরের কোলে মুখ রেখে গোল হয়ে শুয়ে পড়ল টিটু।

'কি হলো রে টিটু, মন খারাপ লাগছে?' আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কিশোর।

আবার আগের মত শুয়ে পড়েছে ডোবার। তাকিয়ে রয়েছে লধশদের দিকে। যেন ভাবছে, 'দূর, কী ঝামেলায়ই না পড়া গেল! কয়েকটা পুঁচকে ছেলেমেয়েকে পাহারা দিয়ে মজা আছে?'

বড় করে হাই তুলল রবিন। ঢুলতে আরম্ভ করল খানিক পরেই।

'এ-ভাবে বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না,' মিশা বলল। 'চলো এক কাজ করি, সবাই মিলে গান ধরি। একঘেয়েমি কাটবে, শীতও কম লাগবে। হয়তো

কুকুরটা খুশি হবে।'

বলেই কারও সায় দেয়ার অপেক্ষায় না থেকে গান শুরু করল সে। একজন একজন করে গলা মেলাতে লাগল তার সঙ্গে। আরেকবার অবাক হওয়ার পালা ডোবারের। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা তুলে জোরে একবার ঘাউ করে উঠল। হুমকি দিল, না বিরক্তি প্রকাশ করল বোঝা গেল না। তাকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল ছেলেমেয়েরা।

'হয়েছে, এবার চুপ করো,' কিশোর বলল। 'পুলিশ আসে কিনা শুনি। খানিক পরে বলে উঠল, 'আরি, ইঞ্জিনের শব্দ না?'

দশ

হ্যাঁ, ইঞ্জিনের শব্দই। জোরাল শব্দ, তারমানে পুলিশের গাড়ি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া হেডলাইটের আলোও খুব তীব্র।

দেখতে দেখতে সেই জায়গাটায় চলে এল গাড়ি, যেখানে কিছুক্ষণ আগে এসে দাঁড়িয়েছিল নিনা আর বাবলি।

পুলিশেরই গাড়ি। ইঞ্জিন বন্ধ হতে না হতেই ঘেউ ঘেউ শুরু করল ডোবার। বনের গাছে প্রতিধ্বনি তুলল তার ডাক।

বুনোপথ ধরে এগিয়ে এল আরেকটা কালো ভ্যান।

'ওটাও পুলিশের,' মুসা বলল। 'পুলিশ তাহলে সত্যি সত্যি এল আমাদের উদ্ধার করতে!'

অস্বস্তি আর দ্বিধায় পড়ে গেছে ডোবার। কী করবে বুঝতে পারছে না। গাড়িকে তাড়া করবে, না ছেলেমেয়েদের পাহারা দেবে? একবার এদিকে তাকাচ্ছে, আবার ওদিকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে টিটু।

'নাহ্, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার!' নিজের হাতে চিমটি কাটল অনিতা।

বুঝতে পারল, স্বপ্ন দেখছে না সে। বাস্তবেই ঘটছে এ সব। প্রথম গাড়িটা থেকে নামল পুলিশের লোক। পা বাড়াল ছেলেমেয়েদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গর্জন করে দাঁত খিঁচাল ডোবার।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুজন পুলিশ। ভ্যানের দিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'এগোনো যাবে না, গ্রেগরি। কুত্তাটাকে সামলাতে হবে আগে, নইলে কিছুই করতে

পারব না।'

'আরও দুটো!' ভ্যানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন। দরজা খুলে গেছে গাড়িটার। 'ওরাও দুটো অ্যালসেশিয়ান নিয়ে এসেছে। যাক, মজা দেখা যাবে কিছুক্ষণ!'

কুকুর দুটোকে আগে নামিয়ে দিয়ে পিছনে নামল একজন লোক। ডোবারের দিকে তাকিয়ে জোরে হাঁক ছাড়ল বিশাল জানোয়ার দুটো। ধড়াস করে উঠল ছেলেমেয়েদের বুক।

'ডোবারের সাথে লড়াই করবে নাকি!' ভয়ে ভয়ে বলল মিশা। 'ওরিব্বাপরে, বাঘের মত লাগছে! দুটোতে মিলে ধরলে ছিঁড়েই ফেলবে ডোবারকে!'

'না, কিছু করবে না,' আশ্বাস দিয়ে বলল কুকুর ধরে আছে যে লোকটা। 'যদি ওই কুকুরটা উল্টোপাল্টা কিছু না করে। আর তোমাদের কুকুরটাকেও ধরে রাখো। তোমরাও চুপচাপ বসে দেখো, কী করে এ-দুটো।'

টিটুর কলার ধরে তাকে কাছে টেনে নিল মিশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। টিটু সাড়াশব্দ করছে না। তারচেয়ে বড় দুটো কুকুরের সঙ্গে শত্রুতা করার কোন ইচ্ছেই নেই তার।

পরের কয়েকটা মিনিটে যা ঘটল, সহজে ভুলতে পারবে না সাতটি ছেলেমেয়ে। ডগ-ট্রেনারকে এর আগে কখনও কুকুর সামলাতে দেখেনি ওরা। ওদের মনে হলো, কুকুর দুটো আর পুলিশের লোকটা যেন পরস্পরের কথা বুঝতে পারছে। এমনকি সে মুখ খোলার আগেই তার মনের কথা বুঝে নিচ্ছে বুদ্ধিমান জানোয়ার দুটো।

'কুকুরগুলোকে ছাড়ব এখন,' আরেকবার ছেলেমেয়েদের সাবধান করল ডগ-ট্রেনার। 'তোমরা চুপ থাকো। ভয়ের কিছু নেই। নড়াচড়া না করলে ওরা কিছু করবে না। ওরা শুধু ওই কুকুরটাকে আটকাবে।'

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। স্তব্ধ হয়ে বসে সেই আলোয় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে লাগল লধশরা। টিটুকে এত জোরে চেপে ধরেছে মিশা, ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট শুরু করল সে। ধীরপায়ে এগিয়ে আসছে পুলিশের কুকুর দুটো। ডোবারের ওপর দৃষ্টি স্থির, একটা গাছের গোড়ায় গিয়ে পিছন করে দাঁড়িয়েছে এখন সে, চোখ চকচক করছে আলোয়, ঝুলে পড়েছে লম্বা জিভ। কুকুর দুটোকে আরও এগোতে দেখে চাপা গর্জন করে উঠল।

'আটকা ওকে, বিডি!' আদেশ দিল ডগ-ট্রেনার।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই লাফে বিস্মিত ডোবারের পিছনে চলে গেল বিডি।

'তুইও যা, রকি!' আবার হলো আদেশ।

চোখের পলকে যেন উড়ে গিয়ে ডোবারের সামনে পড়ল রকি।

এদিক ওদিক সরতে চাইল ডোবার, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই তাকে তা করতে দেয়া হলো না। সারাক্ষণ ভেঙচি কাটার ভঙ্গিতে নীরবে দাঁত বের করে রেখেছে সে। তারপর হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটার ওপর দিয়ে এক লাফ মেরে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকল বনের মধ্যে।

'যা যা, ধরে নিয়ে আয় ওকে!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ডগ-ট্রেনার।

ঝোপঝাড়ের ভিতর যেন মল্লযুদ্ধ শুরু করল তিনটে কুকুর। তবে কোন গর্জন নেই, আহতের আর্তনাদ নেই। তারপর ছেলেমেয়েদের চমকে দিয়ে আবার বেরিয়ে এল ডোবার, লাফ দিয়ে এসে পড়ল একবারে ওদের সামনে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল ওরা। কিন্তু ফিরেও তাকাল না কুকুরটা। ছুটতে লাগল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার পিছু নিল বিডি আর রকি।

ভয় পাচ্ছে বটে কিন্তু খেলাটা বেশ উপভোগ করছে ছেলেমেয়েরা।

'আরি, এ-তো একবারে সার্কাস শুরু হয়ে গেল! ফিসফিসিয়ে কিশোরের কানে কানে বলল মুসা।

আবার বনের ভিতর হারিয়ে গেল ডোবার। পিছু নিল বিডি আর রকি। বেরিয়ে এল। আবার ঢুকল। আবার বেরোল। লুকোচুরি খেলছে যেন। চেঁচিয়ে আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছে ডগ-ট্রেনার।

আরেকবার ঝোপের ভিতর থেকে ডোবার বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ের চামড়া কামড়ে ধরল বিডি। গোঁ গোঁ করে উঠে ঝাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ডোবার। গোঙাতে শুরু করল। বিডিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রকি।

'ধরে রাখ! ছাড়িসনে!' বলল ডগ-ট্রেনার। 'নিয়ে এসো ওকে আমার কাছে!' বলতে বলতে এগোল লোকটা। মোলায়েম গলায় বলল, 'এই, কী নামরে তোর? ডোবার, না? এত বাঁদরামী করিস কেন? আয়, কাছে আয়, লক্ষ্মী ছেলে!'

আরেকবার অবাক হওয়ার পালা ছেলেমেয়েদের।

সামান্যতম প্রতিবাদ করল না ডোবার। সামান্য খোঁড়াচ্ছে। বাধ্য ছেলের মত এগিয়ে গেল ডগ-ট্রেনারের দিকে। ওর ঘাড় ছেড়ে দিয়েছে বিডি, তবে গা ঘেঁষে রয়েছে। আরেক পাশ থেকে চেপে এসেছে রকি। যেন অসুস্থ একজন মানুষকে দুদিক থেকে ধরে নিয়ে চলেছে তার দুই সঙ্গী। পুলিশের কুকুর দুটো লেজ নাড়ছে বিজয়ীর ভঙ্গিতে।

ডোবারের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল ডগ-ট্রেনার। কানের গোড়ায় আঙুল ডলল। দেখতে দেখতে তার বাধ্য হয়ে গেল বেয়াড়া কুকুরটা। চিত হয়ে শুয়ে চার পা তুলে দিল ওপর দিকে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

'সর্বনাশ!' হাঁ হয়ে গেছে বব। 'বশ করে ফেলল! আশ্চর্য! বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার! ইস্, আমিও যদি পারতাম! বুঝেছি, বড় হয়ে ডগ-ট্রেনারই হতে হবে আমাকে।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলেন একজন পুলিশ অফিসার। বললেন, 'এবার উঠতে পারো। বিপদ কেটে গেছে। গাড়িতে এসে ওঠো, বাড়ি নামিয়ে দেব।' সবার মুখের দিকে তাকাল সে। 'মেয়ে দুটো হন্তদন্ত হয়ে থানায় গিয়ে খবর দিল।...তা ব্যাপারটা কি? এত রাতে এই বনের মধ্যে কিজন্যে এসেছিলে? আর ওই কুকুরটাই বা আটকে রেখেছিল কেন তোমাদের? কার কুকুর ওটা?'

গাড়িতে উঠে সব কথা খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে তাকে কথা জুগিয়ে দিল অন্যেরা।

বাধা না দিয়ে ওদের কথা শুনলেন অফিসার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকগুলোর নাম জানো? চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে? মনে হয়, ওদেরকেই খুঁজছি আমরা। কিছুদিন ধরে অতিরিক্ত চুরিডাকাতি হচ্ছে এ-অঞ্চলে। ধরতে পারছি না ব্যাটাদের।'

'একজনের নাম হেনরি ডেরিক,' কিশোর জানাল। 'আরেকজনের নিক...' একটা সরাইখানার পাশ দিয়ে চলার সময় হঠাৎ থেমে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'গাড়ি থামান, গাড়ি থামান!' অফিসারের হাত খামচে ধরল। 'মনে হলো হেনরিকে দেখেছি! সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল, পিছনে নিক!'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। থেমে গেল গাড়ি।

ঠিকই দেখেছে কিশোর। হেনরি আর নিকই। ভিতরে বসে বোধহয় ঝগড়া করছিল এতক্ষণ, নিশ্চয় মেডেলগুলোর জন্যে। বাইরে বেরিয়েও এখন চেঁচামেচি করছে, গাল দিচ্ছে পরস্পরকে। পুলিশের গাড়ির পরোয়াই করছে না। কিংবা বুঝতে পারেনি পুলিশের গাড়ি।

যখন বুঝল, কপালে উঠল চোখ; তখন দেরি হয়ে গেছে। ধরে ফেলা হলো দুজনকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ওদেরকে থানায় নিয়ে চলল পুলিশ।

কিশোরদের বাড়িতে সবাইকে নামিয়ে দিতে বলল ছেলেমেয়েরা। তা-ই করা হলো। অফিসার বললেন, পরদিন দেখা করতে আসবে আবার।

পুলিশ চলে গেলে বব বলল, 'কিশোর, মেডেলগুলোর কথা ওদেরকে বললে না কেন?'

'কেন বলব? খুঁজে বের করলাম আমরা, আর নিয়ে গিয়ে জেনারেলকে দিয়ে বাহবা নেবে পুলিশ, হয়তো পুরস্কারটাও নিয়ে নেবে, তা কেন হতে দেব? ওগুলো জেনারেলের হাতে দেয়া এখন একজনেরই সাজে, রবিনের। কারণ সে কথা দিয়ে এসেছে জেনারেলকে, মেডেলগুলোকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দেবেই।'

এগারো

যার যার বাড়ি ফিরে গেল লধশরা।

মুসাও ফিরে এল। গেটে দেখা হয়ে গেল বোনের সঙ্গে। নিনার সাথে দাঁড়িয়ে আছে বাবলি, উদ্বিগ্ন হয়ে আছে মুসার ফেরার অপেক্ষায়। দেখেই বলে উঠল, 'ফিরলি! আমি তো ভয়ে মরি...!' তারপর মুসাকে অবাক করে দিয়ে যা সচরাচর করে না সে, তাই করে বসল, হাত চেপে ধরল ভাইয়ের। 'যাক, ফিরে এলি! খুব ভয় পাচ্ছিলাম! যা একখান কুত্তা দেখেছি না...পুলিশকে যখন গিয়ে বললাম, প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চায়নি।'

চুপ করল বাবলি। ভাইকে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'মুসা, পুলিশ কী করল গিয়ে?'

কিভাবে ডোবারকে সামলেছে পুলিশের কুকুর দুটো, খুলে বলল মুসা।

'ইস্, তাই নাকি!' আফসোস করতে লাগল নিনা। 'যাওয়া উচিত ছিল আমাদেরও। বাবলি অবশ্য বলেছিল, আমিই রাজি হইনি ভয়ে। মজাটা মিসই করলাম।'

'হ্যাঁ, তা করেছ,' বলে গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। 'আমাদের উপকার করেছ আজ, ঠিক, তবে চুরি করে অন্যের লেখা পড়াটা মোটেও উচিত কাজ নয়।'

'জানি,' মাথা নিচু করে ফেলল বাবলি। 'কিন্তু কী করব বল। নিজেকে সামলাতে তো পারি না। তোর নোটবুকটা মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি। তুলে নিয়ে পড়ে ফেললাম। তারপর নিনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাইকেলে করে।'

'যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তোর এই ছোঁক ছোঁক করার

স্বভাবটা যদি একটু বদলাস, খুশি হব।'

'মেয়েরা ওরকম একআধটু ছোঁক ছোঁক করেই,' বাবলির পক্ষ নিয়ে কথা বলল নিনা।

'কে বলল? তোমাদের মত মেয়েরাই করে। কই, মিশা তো করে না। ডলি আর অনিতাও না। ওসব কথা থাক। তোমরা আজ আমাদের উদ্ধার করেছ, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। ওই হারামী কুত্তাটা তো নড়তেই দিচ্ছিল না আমাদের। মনে হচ্ছিল, বসে থাকতে থাকতে পাথর হয়ে যাব।'

পরদিন সকালটা বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল লধশদের। পুলিশ এল। আরেকবার ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে সব কথা শুনল। রিপোর্ট লিখে নিল।

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' একজন পুলিশ অফিসার বললেন, 'মেডেলগুলো কোথায়! দুই চোরের একজনের পকেটেও নেই। ওরাও অবাক। বাক্স আছে, মেডেল নেই, গেল কোথায়?'

'আশ্চর্য!' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'তাই নাকি?'

মিশাও অবাক হওয়ার ভান করে মাথা ঝাঁকাল।

'অবাক কাণ্ড!' হেসে ফেলার ভয়ে ডলির দিকে তাকাতে পারল না অনিতা। ডলিও আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসল।

'অদ্ভুত ব্যাপার!' বলল বব।

মুসা কিছুই বলল না। কিছু বলতে গিয়ে শেষে যদি সব গুবলেট করে ফেলে এই ভয়ে।

অনেকটা উদাস ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ফেলে টেনে টেনে বলল রবিন, 'ওগুলো কোথায় আছে জানতে পারলে ভাল হত।'

রবিনের এই অভিনয় দেখে হাসি চাপতে কষ্ট হলো অন্যদের। কারণ সবাই জানে ওরা, তার পকেটেই রয়েছে এখন মেডেলগুলো। টিস্যু পেপারে সাবধানে মোড়ানো। রাতের বেলাই কিশোর তাকে দিয়ে দিয়েছিল ওগুলো। সে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল মায়ের কাছে। মা আলমারিতে তুলে রেখেছিলেন, সকালে আবার বের করে দিয়েছেন।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে পুলিশ চলে গেল।

কিশোর বলল, 'এবার যাও, জলদি গিয়ে দিয়ে এসোগে মেডেলগুলো।'

'আমি একা?' রবিন বলল। 'তোমরা যাবে না?'

'না তুমি একাই যাও। তুমি ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছো, তোমার যাওয়াই ভাল।'

'ঠিক আছে।'

এবার আর দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করল না রবিন। গেট দিয়ে সরাসরি ঢুকল। বীরদর্পে। সামনের দরজায় টোকা দিতে খুলে দিল নোরা। 'আরে, রবিন যে! এসো এসো। জেনারেল পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন। ওরা চলে যাবে এখুনি। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন উনি। এসো।'

'পুলিশ!' এখানে এখন পুলিশ আসবে, এটা আশা করেনি রবিন। 'থাক, তাহলে পরেই আসব...'

'আরে না না, এসো,' বলে রবিনের হাত ধরে ফেলল নোরা। 'এসো, কিছু হবে না। ওরা চলে যাবে।'

বসার ঘরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন জেনারেল। রবিনকে দেখে হেসে বললেন, 'আরে, তুমি। কী মনে করে? এসো এসো। আমার মেডেলের বাক্স খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। আশা করছি মেডেলগুলোও পেয়ে যাবে এবারে।'

'না, স্যার, ওই আশা করবেন না,' নরম গলায় বলল একজন অফিসার। 'ওগুলোর কোন খোঁজই জানি না আমরা এখনও। বাক্সটা পেলাম, ব্যস। ভাবলাম নিয়ে যাই।'

'এই ছেলেটা আমাকে কথা দিয়েছে,' হেসে পুলিশকে জানালেন জেনারেল, 'আমার মেডেলগুলো খুঁজে বের করে দেবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছি। মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয় ও। এই তো, পাশের বাড়িতেই থাকে।'

জেনারেলের প্রশংসায় গর্বে বুক ভরে গেল রবিনের।

'বাক্সটা দেখি তো,' হাত বাড়াল সে।

খালি বাক্সটা তুলে নিয়ে রবিনের হাতে দিলেন জেনারেল।

ওটা খুলল রবিন। পকেট থেকে বের করল কাগজে মোড়া ছোট প্যাকেটটা। ধীরে ধীরে মোড়ক খুলে মেডেলগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল বাক্সের ভিতর।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না দুই পুলিশ অফিসার। চেয়ে আছেন। মেডেল! চকচক করছে সোনার মেডেল! স্বপ্ন না তো?

চেয়ে আছেন জেনারেলও। তবে অবাক হননি। হাসিটা শুধু বেড়েছে। বিস্মিত পুলিশ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'কি, বলেছিলাম না? এখন দেখলেন তো? বের করে দিলই। খুব ভাল ছেলে। পুরস্কার ওর পাওয়া উচিত। পাঁচশো ডলার।'

'না না,' থ্যাংক ইউ,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'পুরস্কার আমার লাগবে না। আপনার জিনিস ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি। টাকার দরকার নেই

আমার।'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে,' গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন একজন অফিসার। 'পেলে কোথায় এগুলো?'

'একটা গাছের খোঁড়লে,' হাসিমুখে জবাব দিল রবিন। পুলিশদের এই অবাক হওয়াটা উপভোগ করছে সে।

'তুমিই নিয়ে গিয়ে রেখেছিলে নাকি?'

'আমি কেন রাখব? চোরেরা রেখেছে। আমরা খুঁজে বের করেছি।' বন্ধুদের সহায়তায় কিভাবে বের করেছে, খুলে বলল রবিন। হেনরিকে কিভাবে ফাঁকি দিয়েছে ডলি আর কিশোর, সেকথাও জানাল। নিজের হাতে ওগুলো জেনারেলের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছে ছিল বলেই ওগুলোর কথা পুলিশের কাছে এড়িয়ে গেছে, বলল সেকথা। শুনে মুখ কালো করে ফেললেন অফিসারেরা।

মেডেলগুলো আবার ফিরে পেয়েছেন জেনারেল, আনন্দ আর ধরে না। চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, 'নোরা, এই নোরা, জলদি চা-বিস্কুট দিয়ে যাও! আমার মেডেল ফিরে পেয়েছি! জলদি করো...'

চা খাওয়ার জন্যে বসে থাকলেন না অফিসারেরা। রবিনকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে নিলেন, মেডেলগুলো সে চুরি করেনি। তারপর জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

বার বার রবিনের প্রশংসা করতে লাগলেন জেনারেল।

লজ্জাই পেয়ে গেল রবিন। বলল, 'আসলে, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমি কিছুই করিনি। আমাদের ভাগ্য ভাল, সে-জন্যেই পেয়ে গেছি। পুরোপুরি কাকতালীয় ব্যাপার।'

'আমি তা মনে করি না। মানুষ মনেপ্রাণে যদি কোন জিনিস চায়, সেটা সে করতে পারেই। তুমি জোর গলায় বলেছ আমার মেডেল ফিরিয়ে দেবে, বলায় কোনো দ্বিধা ছিল না, তাই সেটা করতে পেরেছ। তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। মন থেকে কোন জিনিস চাইলে কোন না কোনভাবে সেটা পেয়েই যায় মানুষ।'

সারাটা দিন মেডেলগুলো নিয়ে বুঁদ হয়ে রইলেন জেনারেল। বিকেলের দিকে নোরাকে ডেকে বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে কিছু করা দরকার। পুরস্কার নেয়নি। একটা কুকুরও আছে ওদের সঙ্গে।'

'চিনি। টিটু। কী করতে চান?'

'একটা পার্টি দিলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল।'

'আরেকটা কাজ করতে চাই। আমার একটা মেডেলের উল্টো পিঠে ওদের ক্লাবের নাম খোদাই করে ওদেরকে উপহার দিতে চাই। কী বলো?'

'খুব ভাল হবে। ওরা খুব খুশি হবে। কবে পার্টি দিতে চান?'

'আগামীকাল?'

'ঠিক আছে। যাই। দাওয়াতটা দিয়ে আসি ওদের।'

***
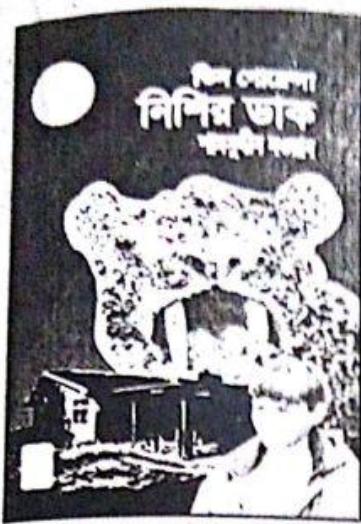
নিশির ডাক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

'আমরা ওঁকে যুম্যান বলে ডাকি।'

মেয়েটির দিকে ঘুরে তাকালাম। আমার খানিকটা দূরে, কিশোর আর মুসার পাশে অ্যাম্বুলেন্সের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। রাস্তার ওপাশের বাড়িটায় মেয়েটিকে দেখেছি আমি। এখানকার বই মেলাতেও দেখা হয়েছে একবার। এক মাথা কালো চুল আর ডাগর কালো চোখ মেয়েটির। বয়স আমাদেরই মত।

নীল বাতি ঝলসাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সটা। সেদিকে চেয়ে ছিলাম আমি।

'কেউ আসল নাম জানে না কিনা তাই সবাই ওঁকে যুম্যান বলে ডাকে,' বলল মেয়েটি।

আমি এবার ভ্রূ কুঁচকে চাইলাম ওর দিকে। নতুন শহরে বেড়াতে এসে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাইছি না। কেননা বন্ধুত্ব দ্রুত জমে ওঠে, তারপর বিদায় নেওয়ার সময় ভয়ানক খারাপ লাগে।

কিজারভিলে আমার জুলি খালার বাসায় বেড়াতে এসেছি আমরা।

'ওঁকে কেন অমন অদ্ভুত নামে ডাকা হয় জিজ্ঞেস করলে না?' প্রশ্ন করল মেয়েটি। গলা শুনে মনে হলো আমাদের অনাগ্রহ ওকে আহত করেছে।

ব্যাকপ্যাকটা হাত বদল করে মেয়েটির দিকে ভাল করে আবারও চাইলাম আমি। চোখ পিটপিট করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

কিশোর জিন্সের পিছনের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল।

'উনি নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানায় কাজ করেন?'

মাথা নেড়ে মৃদু হাসল মেয়েটি। তারপর দেয়ালের উপরদিকে আঙুল নির্দেশ করল।

মুখ তুলে চাইলাম। পাথর ও মেঘলা আকাশ ছাড়া আর কিছুর দেখা পেলাম না।

'দেখতে পাচ্ছ না? কয়েকটার মাথা দেখা যাচ্ছে তো। দেয়ালের চূড়োর

কাছে। আমার বাসায় চলো, আরও ভাল মত দেখতে পাবে। ওদেরকে টপিয়ারি বলে,' দেয়ালটা আবারও ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল।

'টপি কী?' মুসা জবাব চাইল।

'ট-পি-য়া-রি,' ভেঙে ভেঙে বলল মেয়েটি। 'প্ল্যান্টগুলোকে এমনভাবে কাটা হয় যার ফলে পাতাগুলো বিভিন্ন প্রাণীর আকার নেয়। ওই দেখো...'

ড্রাগনের মাথার আকৃতির সবুজ এক পিণ্ড আঙুল দিয়ে দেখাল ও। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে ওটার।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'ওপর দিকের ও দুটো হচ্ছে কান, ওটা নাক, আর ওই বাম্পগুলো ওটার মেরুদণ্ড। দারুণ না?'

'হ্যাঁ,' শ্রাগ করে এগোলাম রাস্তা দিয়ে। কিশোর, মুসা আর মেয়েটি অনুসরণ করল আমাকে।

'ইয়ার্ডে ছোট-খাট ওরকম আরও আছে। খুবই সুন্দর একেকটা।'

'ও, তাই বুঝি,' বললাম। ভয় পাচ্ছি ঠিক তা নয়, তবে কেমন জানি এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে।

'কী ধরনের প্রাণী?' জানতে চাইল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কাল্পনিক বলতে পারো। এই ধরো, বিশাল থাবাওয়ালা ভালুক, কিংবা ডানাধারী সিংহ...'

'জ্যান্ত জানোয়ার কিছু নেই? বিড়াল-টিড়াল?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

'গাছেরও তো জীবন আছে। তবে বিড়াল আছে কি না জানি না।'

হঠাৎই চোখের কোণে সাদা এক ঝলকানি দেখতে পেলাম।

'সাবধান,' বলে মেয়েটিকে এক টানে সরিয়ে আনলাম।

দু'জন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী গেট দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে এল, বাড়িতে যেন আগুন লেগেছে।

চাকা লাগানো এক স্ট্রেচার টানছে একজন, অপরজন ঠেলছে। চিবুক পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা এক বৃদ্ধ শুয়ে স্ট্রেচারের উপর।

'গেটটা একটু বন্ধ করে দেবে?' সামনের জন বলল।

আমি মাথা নেড়ে লোহার কালো হাতলটা চেপে ধরলাম। দু'হাতে ঠেলে ওটাকে লাগাতে হলো। পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়ালাম।

আর তখুনি শুনতে পেলাম বুড়ো লোকটার কথা।

'যেতে পারব না...যেতে দেবে না...ওরা...খাওয়াতে হবে... জানোয়ার... খাবার...'

লোক দুটোর দিকে মুখ তুলে চাইলাম। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ইয়ার্ডে কোন কুকুর-বেড়াল রয়েছে কি না, কিন্তু ওদের ব্যস্ততার কারণে তা আর পারলাম না।

নীল বাতি ঝলসাচ্ছে। তীক্ষ্ণ সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

বৃদ্ধকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কিশোরের দিকে চাইল মেয়েটি।

'তোমার কী মনে হয়, উনি কি প্ল্যান্ট-অ্যানিমেলগুলোর কথা বলছিলেন?'

শ্রাগ করল কিশোর। হেঁটে গেল গেটের কাছে। আমিও গেলাম।

গেটটা যখন লাগাই তখন কোনভাবে নিশ্চয়ই লক হয়ে গেছে। হাতল ধরে টান দিলাম, নড়ল না।

'ধরো তো,' বলে মেয়েটির কাছে ব্যাকপ্যাকটা দিলাম।

প্রায় দশ ফুট খাড়া দেয়ালটা। একটা অংশের পাথর ভাঙা।

'বাস এলে আমাকে ডাক দিয়ো,' বললাম। তারপর দেয়াল বেয়ে ঝটপট উঠতে শুরু করলাম। টের পেলাম কাজটা সহজ নয়।

দেয়ালের মাথায় কনুই দুটো যখন রাখতে পারলাম, তখন হাপরের মত হাঁপাচ্ছি। শরীরটা তুলে নিয়ে দেয়ালের উপর লম্বালম্বি শুয়ে পড়লাম। অমসৃণ পাথরে কনুই ছড়ে গেল, কিন্তু পাত্তা দিলাম না। বুড়োর ইয়ার্ডের সব কিছু এমুহূর্তে পরিষ্কার দৃশ্যমান আমার সামনে।

'কী দেখলে?' প্রশ্ন করল মুসা। ও আর কিশোর নীচে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে।

মোট বারোটা গাছ-জন্তু গুণে ক্ষান্ত দিলাম আমি। গোটা ইয়ার্ড জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বন্ধুদেরকে জানালাম সে কথা। অদ্ভুত সব জন্তু। কোন কোনটা দানবীয়।

ভালুকটাকে দেখলাম, মেয়েটি যেটার কথা বলেছিল। আকারে জ্যান্ত ভালুকের দ্বিগুণ। প্রকাণ্ড থাবা দুটো থেকে কাঠের ছোরার মত বেরিয়ে আছে নগ্ন ডাল।

অতিকায় ঘনকালো এক ঝোপকে বাঘের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। বড় বড় দুটো বাঁকা দাঁত বেরিয়েছে ওটার।

ডানাওয়ালা সিংহটাকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু সামনাসামনি দেখতে পেলাম ড্রাগনটাকে। হলদে-সবুজ এক উদ্ভিদ থেকে জন্মেছে। চারটে শিকড়।

প্রতিটা শিকড় একটা করে পায়ের কাজ করছে। ডানা দুটো আর দাঁতগুলো ছোট। হলুদ-সবুজ পাতার কারণে দেখে মনে হয় অসংখ্য কাঁটা ধারণ করে রয়েছে। বাতাসের দোলায় পাতা নড়ে উঠতে মনে হলো বুঝি শ্বাস নিচ্ছে ড্রাগনটা।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছি, টের পেলাম গলা শুকিয়ে কাঠ। এতক্ষণ হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম গাছ-জন্তুগুলোকে।

বাতাসের ঝাপ্টায় চোখের উপর এসে পড়ল চুল। পাতার নড়াচড়া অদ্ভুত এক ফিসফিসানির শব্দ তুলল। উদ্ভিদগুলো যেন কথা বলছে। ঘাড়ের কাছে চুল দাঁড়িয়ে গেল আমার। ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতরটা। আশ্চর্য এক অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি ইয়ার্ডে ছিল, এইমাত্র আমার দিকে ঝট করে চোখ তুলে চেয়েছে।

দুই

'অ্যাই, রবিন, বাস আসছে!' মুসার গলা।

নীচের দিকে তাকাতেই তাল হারালাম। পড়ে গেলাম পিছনদিকে। দেয়ালটায় থাবা মারলাম। উপরদিকটা আঙুলে ঠেকল। পা একটা পাথর খুঁজে পেলে মুহূর্তের জন্য ঝুলে রইলাম। এবার অপর পা-টাও পাথরে রেখে নেমে যেতে লাগলাম।

'জলদি এসো!' জরুরী কণ্ঠে চেঁচাল কিশোর।

'তোমরা চলে যাও, আমি পরে আসছি,' ওপার থেকে পাল্টা চিৎকার ছাড়লাম।

বই মেলায় যাচ্ছিলাম আমরা। আমার ব্যাকপ্যাকটা রয়ে গেল মেয়েটির কাছে। থাকুক, অসুবিধে নেই।

কিশোর আর মুসা নিশ্চয়ই দ্বিধায় পড়ে গেছে যাবে কি যাবে না।

'আমার জন্য ভেবো না, তোমরা যাও,' আবারও বললাম আমি। 'পরে দেখা হবে।'

ওরা দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল। বাসটাকে চলে যেতে দেখলাম।

হাতের পিঠ আর আঙুলের চামড়া ছড়ে গেছে। দেয়াল থেকে নামতে গিয়ে জিন্সটাও গেছে ফেঁসে। সব দিক থেকে ক্ষতি।

বই মেলাতে আর যাইনি। সারাটা বিকেল কেটে গেল বুড়োর কথা ভেবে। গাছগুলো ছাড়া বুড়োর আর কি কোন জীব-জানোয়ার আছে? ভাল মত একবার দেখে আসা দরকার। আমি ঠিক জানি, আমি কাউকে দেখেছি এবং আমাকেও কেউ দেখেছে।

বাড়ি ফিরে দরজা লাগাতেই টের পেয়ে গেলেন জুলি খালা।

'রবিন, ফিরলি?' চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এদিকে একবার আসবি, বাবা?'

বুঝলাম তাঁর কোন কাজ আছে। দোকান-টোকানে যেতে হবে।

প্রায় ডিনারের সময় পর্যন্ত নানা টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো আমাকে। তারপর সুইস আর্মি নাইফটা জ্যাকেটের পকেটে পুরলাম। আরেক পকেটে এক ক্যান টিউনা লুকিয়ে ভরে ফেললাম। এবার পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। জুলি খালাকে আওয়াজ দিয়ে এসেছি বাইরে হাওয়া খেতে যাচ্ছি।

কিশোররা মেলা থেকে এখনও ফেরেনি। সূর্য ডুবে গেছে। স্ট্রীট লাইটগুলো সবে জ্বলে উঠছে।

মাথার উপরে লাল আর পাশে হলদে রং ধরেছে আকাশ। দেয়াল বেয়ে ওঠা আর ভিতর থেকে গেট খুলবার জন্য খুব বেশিক্ষণ আলো পাব না আমি।

দেয়ালটার দিকে চেয়ে রইলাম দু'মুহূর্ত। মনকে বোঝালাম পারব। এবার বাইতে শুরু করলাম।

বিকেলের চাইতে কাজটা সহজ লাগছে এখন।

উপরে হাত ঠেকবার পর এক ঝটকায় তুলে ফেললাম শরীরটা। এখন বসতে পারব।

শুনতে পেলাম গাছের পাতা হিস-হিস শব্দ করে কাকে যেন চুপ করতে বলছে।

এবার নীচে ইয়ার্ডের দিকে চোখ রাখলাম।

দৃষ্টি সরিয়ে আনলাম পরমুহূর্তে। মনে হলো যেন নীচের জমিটা স্রেফ উধাও হয়ে গেছে। পড়ে রয়েছে কালো এক গহ্বর।

দেখতে পাচ্ছি গহ্বর থেকে মাথা তুলেছে আশ্চর্য গাছগুলো। আমার পিছন থেকে আসা রাস্তার আলোয় ভুতুড়ে আকার নিয়েছে ওগুলো। পাতাগুলোকে এখন আর পাতার মত দেখাচ্ছে না। বরঞ্চ ওগুলোকে এমুহূর্তে নিরেট দেহ বলে মনে হচ্ছে। শিউরে উঠে জ্যাকেটটার মধ্যে গুটিসুটি মারলাম। এগুলো উদ্ভিদ বই তো নয়, স্রেফ উদ্ভিদ–নিজেকে সাহস দিলাম।

আমার প্ল্যান ছিল কোন একটা টপিয়ারি গাছ বেয়ে নেমে যাব। পা বাড়ালেই

ড্রাগনটার নাকের উপর দাঁড়াতে পারি। কিন্তু বিকেলে দেখা চোখা ডালগুলোর কথা ভেবে ও পথ মাড়ালাম না। নিজেকে বোঝালাম, আমি আসলে ডালের খোঁচা খেতে চাই না–ব্যস, আর কিছু না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ড্রাগনটার কেঠো দাঁতের ধারে কাছেও পা নিয়ে যেতে চাই না।

কাজেই শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে পাথর বেয়ে নামতে শুরু করলাম।

নামাটা খুবই কঠিন হলো। পা গেল পিছলে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে আরেকটা পাথরে রাখবার চেষ্টা করলাম জুতোটা।

আবার সেই গা ছমছমে অনুভূতিটা ফিরে এল।

কী যেন গোপনে লক্ষ করেছে আমাকে। এবং এখনও করছে।

ঘুরে তাকালাম। নখ দাবিয়ে দিলাম পাথরের খাঁজে। মাটির দিকে চেয়ে রইলাম যতক্ষণ না চোখ টনটন করে উঠল। অবশ্য সবুজ ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না আমার। বাতাসে চুল উড়ে এসে পড়ছে চোখে, জ্বালা করছে খোঁচা লেগে। হাত দুটো ছিঁড়ে পড়তে চাইছে ঝুলে থাকতে থাকতে। নামতে হবে এবার। দমকা হাওয়া দিচ্ছে। খটাখট শব্দ করছে ডাল।

হঠাৎই আমার পিঠে বাড়ি মারল গাছের একটা শাখা। আরেকটা ডাল চাবুক কষাল দু'হাতের উপর–তীক্ষ্ণ নখর আঁচড় কাটল যেন। তারস্বরে চিৎকার ছাড়লাম, কিন্তু দেয়াল আর বাতাস টিপে মারল শব্দটাকে।

ঝুলে থাকতে চাইছি, কিন্তু পারলাম না। পিছলে গেল আঙুলগুলো। আরেকটা পাথর ধরতে চাইলাম শক্ত করে, হলো না।

মসৃণ পাথরে পিছলে গেল হাত।

পড়ে যাচ্ছি আমি।

তিন

মাটিতে ধপাস করে পড়তেই বুকে চেপে রাখা দমটুকু বেরিয়ে গেল। মনে হলো কেউ বুঝি আমার বুকে ভারী দুটো পা চাপিয়ে দিয়েছে। হাড়-টাড় ভাঙলে কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না। বেড়াতে এসে খালা-খালুকে বিপদে ফেলা কোন কাজের কথা নয়। যাক সেকথা, মুখ দিয়ে শ্বাস টেনে উঠে বসলাম আমি।

দেয়ালের এপাশ থেকে আকাশটাকে আরও কালচে দেখাচ্ছে। আশপাশে উদ্ভিদগুলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সটান উঠে দাঁড়ালাম। চেষ্টা করছি শান্ত থাকতে। কেন তা জানি না, কিন্তু মন বলছে।

ইয়ার্ড থেকে বুড়োর বাড়িটা পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই, গাছ-পালার সংখ্যা এতটাই বেশি। আর মাটিতে দাঁড়িয়ে গাছগুলোকে বেয়াড়া রকমের লম্বা বলে মনে হচ্ছে।

'এই, কিটি,' গলা খাদে নামিয়ে বিড়ালটাকে ডাকলাম। অত ভয় পাচ্ছি কেন? এবার গলা একটু চড়িয়ে ডাকলাম, 'এই, কিটি।'

বাতাসে মর্মর শব্দ তুলল চারপাশের ঝোপ-ঝাড়।

ঠিক করলাম ডাকাডাকি না করে চারদিকে খুঁজে দেখব।

বুড়ো মানুষটা যত্ন করে বুনেছেন তাঁর জানোয়ারগুলোকে–তাঁর টপিয়ারি–ফলে ইয়ার্ডে প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব বাড়তি জমি রয়েছে।

আমি ওগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলাম। যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখছি। কাছ থেকে এগুলোকে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হলো একটা শুঁয়োপোকা ঘাড়ের কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

কে যেন লক্ষ করছে আমাকে।

এবার মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলাম।

বাড়িটার ঠিক সামনে। আমার তিনটের সমান। হাঁ-টা এতটাই বিশাল ওটার, আমি চাইলেই মাথা গলিয়ে দিতে পারি। কী জাতের উদ্ভিদ ওটা চিনতে পারলাম না, কিন্তু বুড়ো ওটাকে যে আকার দান করেছেন তা চিনতে কষ্ট হলো না। সিংহের মত চেহারা। ডানাধারী বিশালকায় এক সিংহ।

হাঁ করে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি।

একটা থাবা বাড়ানো ওটার, এই বুঝি মেরে বসবে আমাকে। বুড়ো–মানে যুম্যান এমনভাবে ডাল কেটেছেন যার ফলে দেখে মনে হবে সিংহটার থাবায় নখর রয়েছে। পাতাবহুল থাবা থেকে সত্যিকারের নখ বেরিয়েছে যেন।

রাস্তার আলোয় চকচক করছে কাঠের নখরগুলো, সাদা আর তীক্ষ্ণ।

'ওটা স্রেফ একটা প্ল্যান্ট বই তো নয়,' মনে মনে আওড়ালাম। পকেটে ভরে দিলাম দু'হাত। সুইস আর্মি নাইফে চেপে বসল মুঠো। মনে খানিকটা বল পেলাম।

ছোরায় এক হাত রেখে অপর হাতটা বের করে ফেললাম। আমি প্রমাণ করে

দেব এটা নিছকই এক উদ্ভিদ।

ওটার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেলাম। আলতো করে একটা পাতা স্পর্শ করে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলাম। যেন তপ্ত হাঁড়ির ছ্যাকা খেয়েছি। কিছুই ঘটল না। হাত বাড়ালাম আবারও, ভয় খানিকটা কমেছে। এই নিঃসঙ্গ পরিবেশে অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করছি। কোনভাবে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো গেলে মুখটা স্পর্শ করতে পারতাম।

'আউ!' এক টানে হাত সরালাম। ধারাল কী যেন খোঁচা মেরেছে আঙুলে। মুখে আঙুল পুরে রক্তের স্বাদ পেলাম। কাঁটা লেগেছে নিশ্চয়ই, ভাবলাম। আলগোছে সরে এলাম।

ইয়ার্ডের চারধারে নজর বুলাচ্ছি, অবশ্য ডানাধারী সিংহ-গাছটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। ভাল লাগছে না আমার। একটা গাছকেও সুবিধের মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে এই সিংহটাকে।

কোনার দিকে এক ইস্পাতের শেড দেখতে পেলাম।

শেডের দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে এতটাই অন্ধকার–কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ইস, খালুর বড় ফ্ল্যাশলাইটটা কেন যে আনলাম না, কিংবা আমার পকেট লাইটটা।

দরজা ঠেলে খুলবার পর আঁধার খানিকটা কমল। তবে একটা ছোট বস্তা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। ওটা টেনে বাইরে বের করে চোখের সামনে তুলে ধরলাম, জিনিসটা কী দেখবার জন্য।

হাড়ের গুঁড়ো।

কালো গোটা গোটা হরফে লেবেলটা লেখা হয়েছে। পুরানো হাড়ে যেমন হয় তেমনি এক ছাতাপড়া, শুকনো গন্ধ। ভক্ করে নাকে এসে লাগল। বস্তার মুখ বন্ধ করে শেডের ভিতর আবার রেখে এলাম।

আচমকা খস-খস শব্দ উঠল পিছন দিক থেকে।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালাম। বাতাসের শব্দ এটা নয়। হলে অনুভব করতাম। অন্য কিছু একটা নাড়িয়েছে উদ্ভিদের পাতা। পকেটে হাত ভরলাম আবার। ইয়ার্ডে দৃষ্টি মেলে দিলাম, কিন্তু কোন কিছুই নড়তে দেখলাম না।

হাঁটু গেড়ে বসে ছোরা আর টিউনার ক্যানটা বের করলাম। ক্যানটা খুললাম। শেডের সবচাইতে কাছের গাছটার পাশে রেখে দিলাম ওটা। বুড়ো হয়তো বা পোষা বেড়ালটার জন্য শেড খুলে রেখেছিলেন। মানে আমার তাই ধারণা আরকী।

এবার গেটের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

হাঁটছি আর কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাচ্ছি। বাতাস বইতে শুরু করেছে আবার। পাতার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে লোকজন নিচু স্বরে কথা বলছে।

ঘুরে দাঁড়ালাম, সিংহ-গাছটিকে যাতে দেখতে পাই। আমি মনে প্রাণে চাইছি ওটা বাড়ির পাশে বসে থাকুক। ডানা মেলে, মাটি ফুঁড়ে উড়াল দিলেই সর্বনাশ।

দেখতে পেলাম ওটা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। হঠাৎ বাহুতে ডাল-পাতার ঘষা অনুভব করলাম।

ডাক ছেড়ে এক লাফে পিছিয়ে এলাম। পায়ে পা বেধে পড়ে গেলাম হোঁচট খেয়ে। মুখ তুলে অতিকায় ভালুকটার দিকে চাইলাম। গেটে যাওয়ার পথ আগলে রেখেছে ওটার বাহু। আমি সোজা এসে পড়েছি ভালুকটার সামনে।

ধড়াস-ধড়াস বাড়ি পড়ছে বুকের ভিতর, উঠে দাঁড়ালাম, দৌড়ে গেলাম গেটের কাছে। একবারও পিছু ফিরে চাইনি। ভালুকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে কিনা কে জানে।

এতটাই জোরে দৌড়েছি, কাঠের গেটে দড়াম করে আছড়ে পড়লাম। ধাতব ল্যাচ আঁকড়ে ধরল আমার হাত। ল্যাচ পেঁচিয়ে ধরতে পারলাম দু'বারের চেষ্টায়। এবার ঠেলা দিয়ে খুললাম গেটটা। আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম সাইডওয়কে।

বাইরে বেরিয়ে, স্ট্রীট লাইটের নীচে এসে ঘুরে দাঁড়ালাম।

নিজেকে আস্ত এক গর্দভ মনে হলো। গেট দিয়ে ঠিকরে আসা বাতির আলোয় গাছগুলোকে নিছক গাছের মতই দেখাচ্ছে।

ভালুকটা ঘুরে দাঁড়ায়নি। আমি নিজেই ওটার কাছে গিয়ে খামোকা ভয় পেয়েছি।

আঁধারে উঁকি দিয়ে ডানাধারী সিংহটাকে খুঁজলাম। বাসার পাশে বসে ওটা, সামনে থাবা দুটো ভাঁজ করা। ডানা দুটোকে এখন স্রেফ লতার মত দেখাচ্ছে, অন্য কিচ্ছু না। আমি বোকার মত ভেবেছিলাম একটা থাবা বুঝি শূন্যে তুলেছে ওটা।

গেটটা ভেজিয়ে দিলাম। এমনভাবে লাগিয়েছি যাতে লক হয়ে না যায়। এবার বাড়ির পথ ধরলাম।

'ব্যাগটা নেবে না?'

বই মেলায় আজও এসেছি আমরা। বিশাল মেলা তো, প্রচুর বই। ঘুরে ঘুরে

দেখা, বাছাই করে কেনা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবু পছন্দ করে গোটা চারেক বই কিনেছি আমি। কিশোর আর মুসাও কিনেছে।

ক্যান্টিনে বসে স্যান্ডউইচ চিবাচ্ছিলাম আমরা, মুখ তুলে চাইলাম। কালকের সেই মেয়েটি।

'আমাদের স্টলে তোমার ব্যাগটা রাখা আছে,' জানাল। 'তোমার বন্ধুদের হাতে দিতে পারতাম কিন্তু দিইনি। তুমি যেহেতু আমার হাতে দিয়েছিলে। ওরা নিশ্চয়ই বলেছে?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। একটু পরেই ব্যাগটা আনতে যেতাম মেয়েটির বাবার স্টল থেকে। ভদ্রলোক একজন প্রকাশক। কিশোরদের মুখে শুনেছি।

চলে গেল মেয়েটি। খানিক বাদে ফিরে এল আমার ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে।

'ধন্যবাদ,' বললাম। ব্যাকপ্যাকটা আমার পাশে নামিয়ে রাখলাম।

মুসা মেয়েটির দিকে চাইল।

'স্যান্ডউইচ চলবে?' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল।

নাক কুঁচকাল মেয়েটি। মাথা নেড়ে বেঞ্চির ওপাশে বসল।

'আমার কাছ থেকে অর্ধেকটা পীনাট বাটার যদি নাও তবে তোমার অর্ধেকটা আপেল নিতে পারি।'

মুসার সঙ্গে খাবার পাল্টাপাল্টি হলো। আপেল চিবাবার ফাঁকে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি।

'আমার নাম স্যালি।'

'আমি রবিন, ও কিশোর আর ও মুসা। আমরা তিন বন্ধু।'

'তোমার নাম জানি,' আমাকে লক্ষ্য করে বলল। 'ব্যাকপ্যাকে লেখা আছে। আচ্ছা, য়ুম্যানের ইয়ার্ডে কোন বিড়াল-টিড়াল পেলে?'

খাওয়া ভুলে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

'অবাক হচ্ছ কেন? তোমাকে ওঁর ইয়ার্ডে নামতে দেখেছি। আমার ঘর থেকে সব দেখা যায়। সিঁড়ির মাথায় কিনা।'

'আচ্ছা, হাসপাতালটা কোথায়, জানো?' গোয়েন্দাপ্রধান প্রশ্ন করল। বন্ধুরা আমার মুখে কাল রাতের অভিযানের কথা সবই শুনেছে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'ওঁকে দেখতে যাব আমরা।'

'কাকে? য়ুম্যানকে?'

'হ্যাঁ। ওঁকে ওঁর পোষা জানোয়ারের কথা জিজ্ঞেস করব,' বললাম আমি।

আজ সকালেও বৃদ্ধের ইয়ার্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। দিনের বেলা মোটেও ভয় করেনি। গেট খোলা থাকায় ভিতরে আসা-যাওয়া করা কোন ব্যাপারই নয়। তারপরও বেশিক্ষণ থাকিনি আমি। টিউনা ক্যানটা ওখানে নেই জানবার জন্য ঠিক যেটুকু সময় থাকা দরকার ছিল। টিউনা খেয়েছে কোন এক প্রাণী। এবং ক্যানটাকেও টেনে নিয়ে গেছে। বুড়োর বেড়াল হয়তো একটা নয়, কয়েকটা। তারই একটা ক্যান টেনে নিয়ে গিয়ে টিউনা সাবড়েছে। বন্ধুদের সামনে একথাই বললাম। আমি খুব একটা নিশ্চিত নই কে খেয়েছে টিউনা। সেজন্যই আসলে য়ুম্যানের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

'ওখানে কীভাবে যেতে হয় জানি আমি,' বলল স্যালি। 'শহরের শেষ প্রান্তে বাস থেকে নামলে বাকিটুকু হেঁটে যাওয়া যাবে।'

কিশোরকে চিন্তিত দেখলাম। হয়তো স্যালিকে সঙ্গে নেবে কি না ভাবছে। শেষমেশ মাথা ঝাঁকাল। তার মানে রাজি। আমরাও কেউ আপত্তি করলাম না।

আমরা যা ভেবেছিলাম তার চাইতে হাসপাতালে হেঁটে যেতে বেশি সময় লাগল। প্রায় গাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।

হাসপাতালের পিছনে পাইন গাছের সারি। বনভূমির সীমানা নির্দেশ করছে।

স্যালিকে রিসেপশনে অপেক্ষা করতে বললাম। আমার ব্যাকপ্যাকটা রাখতে দিলাম ওর কাছে।

গোলাপি-সাদা পোশাক পরা এক মহিলা বসে ছিলেন ডেস্কে। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। আর ঠিক তখুনি কেন জানি আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। মনে হলো ঝামেলায় জড়াতে চলেছি।

'কী ব্যাপার বলো?'

কী বলব, য়ুম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই? বুড়োর নামটাও তো জানি না ছাই। পিছনের পকেটে দু'হাত ভরে দিলাম।

এগিয়ে এল গোয়েন্দাপ্রধান।

'উম···কাল এক বুড়ো ভদ্রলোককে এখানে আনা হয়েছে। ···আমরা ওঁর প্রতিবেশী।' আমার মার সঙ্গে মহিলার চোখের ভাষার অদ্ভুত মিল দেখতে পেলাম। আমার মা যখন আমার কোন অনুরোধ মোলায়েমভাবে ফিরিয়ে দেন তখন তাঁকেও ঠিক এমনি দেখায়।

'নামটা বলতে পারবে?'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। স্যালির দিকে চেয়ে দেখি ও

কোপের মধ্যে চড়ুই পাখির ওড়াওড়ি দেখছে।

নার্সের দিকে চাইল মুসা।

'আমরা ওঁর পোষা জানোয়ারগুলোর দেখাশোনা করতে চাই। সেজন্য তাঁকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।'

'বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। ভিজিটিং আওয়ার আটটা পর্যন্ত।' বলেই একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিয়ে হাঁটা দিলেন।

আমরা তিন বন্ধু মুহূর্তের জন্য থমকে গেলাম। তারপর তাঁকে অনুসরণ করলাম।

বাইরে থেকে বোঝা যায়নি হাসপাতালটা এত বড়। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যে চলে এলাম নিজেরাও জানি না। অবশেষে বুড়ো মানুষদের গোঙানির শব্দ অনুসরণ করে চলতে লাগলাম।

কেউ কেউ কথা-বার্তা বলছেন নিজেদের মধ্যে। সেই বৃদ্ধের মত বিড়বিড় করে কী সব আওড়াচ্ছেন।

কান পেতে হলঘর ধরে পা চালাচ্ছি। লোকজন আর বাচ্চাদের কান্না এড়িয়ে চলেছি তিন বন্ধু। আমাদের ভঙ্গিটা এমন, যেন কোথায় যেতে হবে জানা আছে।

কিন্তু খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসব, এমনি সময় এক মহিলার কণ্ঠ কানে এল।

'লোরা, ফর্মটা পূরণ করতে পারছি না। বারবার খালি পোষা জানোয়ারগুলোর যত্ন নিতে বলছে। এত দুশ্চিন্তা কেন বুঝতে পারছি না।'

দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিলাম আমরা। মহিলা দু'জনকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখলাম। ওঁদের পরনে সাদা প্যান্ট ও টপ।

ওঁরা বাঁক ঘুরতেই বেরিয়ে এলাম আমরা, প্রতিটা কামরায় খোঁজ করছি। নার্সরা বেরিয়ে এসেছেন যে ঘর থেকে তারই আশপাশে বৃদ্ধ যুম্যান রয়েছেন।

একটা দরজা খুলে ভিতরে মাথা গলিয়ে দিলাম। এবং কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলাম: 'খাবার...দিতেই হবে...আমাকে ছাড়বে না ওরা...অসুস্থ ছিলাম...দু'দিন খাবার দিতে পারিনি বলে...কী মারটাই না মারল...'

কিশোর আর মুসাও শুনতে পেয়েছে কথাগুলো।

ঘরের জানালাগুলো কালো পর্দায় ঢাকা। রাতের আঁধার নেমে এসেছে যেন। এক কোণে একটা বাতি। ম্লান হলদেটে আলোয় গোটা কামরাটাকে অসুস্থ-রুগ্ন দেখাচ্ছে।

বিছানা থেকে অস্ফুট বিড়বিড়ানির শব্দ ভেসে এল। ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার ও ট্রে দেখা গেল।

আমরা সন্তর্পণে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম তাঁর বিছানা লক্ষ্য করে।

বৃদ্ধের গায়ে হাড় ক'খানাই আছে শুধু। সর্বাঙ্গে কালশিটে আর ক্ষতচিহ্ন। বাহুতে টিউব নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। চুলগুলো দেখে মনে হলো কেউ বুঝি আঠা দিয়ে সাদা-সাদা তুলো সেঁটে দিয়েছে মাথা জুড়ে। বুড়ো মানুষটাকে এরকম নির্দয়ের মত কে মারল?

'খাবার দিতে হবে...ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে...' আওড়াচ্ছেন তন্দ্রার মধ্যে।

'মিস্টার,' গোয়েন্দাপ্রধান ঝুঁকে পড়ল ওঁর উপরে। নাক কুঁচকাল ওষুধের গন্ধে। হাসপাতালের নিজস্ব এক গন্ধ আছে। সবার সহ্য হয় না। মাথাটা ঘুরে উঠল আমার।

'মিস্টার,' মুসাও মৃদু কণ্ঠে ডাকল।

মাথা কাত করলেন বৃদ্ধ।

ওঁর জখমী বাহু স্পর্শ করলাম আমি। শুকনো আর ঠাণ্ডা।

'মিস্টার, কী পালেন আপনি? বেড়াল?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'ছাঁটতে হবে...'

বেড়ালের লোম ছাঁটতে হয় নাকি? বেচারী হয়তো ডাল-পালা ছাঁটা আর বেড়ালের খাবার দেওয়ার ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন।

'আপনি কি কুকুরের কথা বলছেন?' মুসা প্রশ্ন করল।

কিন্তু আমি তো উঠনে কোন কুকুরের ডাক শুনিনি। কুকুর থাকলে নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকত না।

'খাবার দাওগে যাও...যাও...'

ঘুমিয়ে পড়ছেন বৃদ্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী আর নিয়মিত হচ্ছে। ওঁকে আলতো করে ঝাঁকুনি দিলাম, কিন্তু কোন কথা বের করা গেল না।

কাজেই কামরা ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম আমরা।

'উনি কি বাড়ি ফিরবেন?' স্যালি প্রশ্ন করল।

শ্রাগ করে কাঁধ বদল করলাম ব্যাকপ্যাক।

'হয়তো, তবে দেরি হবে।'

বাসার কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। বুড়োর বাড়ির দিকে চাইলাম। গাছ-জন্তুদের মাথার কাছটা দেখা যাচ্ছে। ওদের ভাবখানা এমন যেন এখুনি দেয়াল টপকে উঁকি দিয়ে দেখবে।

'আচ্ছা, রবিন, উনি কি বেড়ালকে খাবার দিতে বললেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। ইতোমধ্যে কয়েকবার করা হয়ে গেছে প্রশ্নটা।

ঘুরে তাকালাম ওর দিকে।

'তুমি নিজেও তো সব শুনেছ।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'এটুকু বোঝা গেল উনি কাউকে খাবার দেন।'

খাবার দেওয়ার ভারটা আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।

সে রাতে আরেক ক্যান টিউনা ফ্রিজ থেকে বের করলাম। সাঁঝ ঘনাবার আগেই ঢুকতে হবে ঘুম্যানের বাড়িতে। ঠিক করলাম, কাল স্টোরে গিয়ে ক্যাট ফুড কিনে আনব। প্রয়োজনে এক ব্যাগ কিনব।

গাছগুলো পরের সপ্তাহ থেকে সৌন্দর্য হারাতে লাগল। ভালুকের মাথা থেকে ডাল বেরিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে শিং গজিয়েছে ষাঁড়ের। সবকটা গাছকে কেমন জানি অবিন্যস্ত দেখাচ্ছে। সিংহের কেশর অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। ডানা দুটোও। ড্রাগনটাকে দেখে মনে হচ্ছে না মেরুদণ্ড রয়েছে। ঠিক সেই বেড়ালের মত দেখাচ্ছে, বাঁকা হয়ে উঠে নিজেকে যেটা লম্বা করবার চেষ্টা করছে। অবশ্য দাঁত-নখ আগেকার মতই শাণিত দেখাচ্ছে সব কটার।

ব্যাগ ভর্তি ক্যাট ফুড দিয়ে যাচ্ছি গত এক হপ্তা ধরে। রোজ সকালে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি বেমালুম হাওয়া। একেবারে ব্যাগসুদ্ধ। কীসে খাচ্ছে ব্যাগগুলোকে?

জানবার একটাই উপায়। রাতে যেতে হবে ওখানে। গিয়ে নিজের চোখে দেখতে হবে কী ঘটে।

সে রাতে, খালা-খালু শুয়ে পড়বার পর ঘর থেকে বেরোলাম। আমাকে যেন নিশি ডাকছে। উপেক্ষা করতে পারছি না আমি। আস্তে করে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। এক থেকে একশো পর্যন্ত গুণলাম। কিশোর আর মুসা সিনেমা দেখছে দেখুক, ওদেরকে রাত্তিরবেলা ঝামেলায় জড়াবার দরকার নেই। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে ডাকব না ঠিক করেছি।

জিন্স, স্নিকার্স আর সোয়েট শার্ট পরনে আমার। ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে আলগোছে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ব্যাকপ্যাকে যা যা লাগতে পারে সবই ভরা হয়েছে। খালুর ফ্ল্যাশলাইট, ক্যাট ফুড আর আমার সুইস আর্মি নাইফ।

সাইডওয়াক স্ট্রীটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। গেটের দিকে পা বাড়ালাম। কাজটা কি ঠিক করছি? নিজেও জানি না। দুটো কারণে ফিরেও যেতে পারছি না। একটা হচ্ছে, ঘুম্যানের বেড়ালের জন্য আজ রাতে খাবার রেখে যাইনি। আর স্যালি হয়তো ঘরে বসে লক্ষ রাখছে আমার উপর। ওর কাছে ভীরু প্রমাণিত হতে চাই না।

স্যালির বাসার দিকে এক ঝলক চাউনি বুলালাম। নীচতলায় আলো জ্বলতে দেখলাম। লিভিংরূমে টিভি স্ক্রীনের নীলচে ঝলকানি। উপরতলার ঘরটা-স্যালি যেটায় থাকে-অন্ধকার।

দেয়ালের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম গেটের সামনে। তারপর বুক ভরে শ্বাস টেনে পা রাখলাম ভিতরে।

ইয়ার্ডে ঢুকতেই ছমছম করে উঠল সারা শরীর। প্ল্যান্টগুলো আরও বাড়ন্ত হয়েছে। নখর আরও দু'ইঞ্চি বেড়ে গেছে যেন ভালুকটার। ড্রাগনটাকে দেখাচ্ছে ডাইনোসরের মত। ঘাড়ের কাছে বর্ম আর মাথায় শিং থাকে যেগুলোর। সিংহটার তেমন একটা পরিবর্তন দেখা গেল না, তবে ডানা দুটো থেকে যেন পালক গজিয়েছে।

পা টিপে টিপে শেডটার দিকে এগোলাম। টপিয়ারিগুলোর দিকে তাকাচ্ছি না।

হাতল ধরে টানতেই ধাতব দরজাটা ককিয়ে উঠে খুলে গেল। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিলাম। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে জ্বলন্ত বলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল আলো।

ক্যাট ফুডের ব্যাগটা প্ল্যান্টগুলোর কাছে রেখে শেডে এসে মাটিতে বসলাম। ঘণ্টাখানেক দেখে তারপর বাড়ি চলে যাব। ঘড়ি দেখলাম। দশটা তিন।

বসে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা। হাতে হাত ঘষে গরম করবার চেষ্টা করছি। ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিলাম। চাঁদ উঠেছে, ফলে সমস্যা হলো না।

চাঁদের আলোয় গাছগুলোর দুরবস্থা আরও প্রকট হলো।

আঁধারে আউটলাইন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু চাঁদের রুপোলী আলোয় বিচিত্র সব রূপ ধরল গাছগুলো। আকাশের পটভূমিতে অসম্ভব বড় দেখাচ্ছে ওদেরকে। সহসা বাতাস খেলে গেলে ঠকাঠক বাড়ি খেল ডাল। পাতার খসখসানি পুরানো অস্বস্তিটা ফিরিয়ে আনল আমার মধ্যে। আবারও মনে হচ্ছে কেউ যেন গোপনে লক্ষ করছে আমাকে।

হাঁটু দুটো জোড়া লাগিয়ে চিবুক রাখলাম তার উপর। চলে যাব কিনা ভাবছি,

ইস, বন্ধুরা যদি সঙ্গে থাকত এতটা ভয় করত না আমার। এখন তো বেরিয়ে যেতে চাইলেও ভুতুড়ে গাছগুলোর পাশ কাটাতে হবে।

শেষমেশ ভাবলাম আরও খানিকক্ষণ দেখি। বাতাসটা অন্তত থামুক।

হঠাৎই সচকিত হয়ে উঠলাম গেট খুলবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে।

চার

দম বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধুপ-ধাপ শব্দ। কেউ কিংবা কিছু কি ভিতরে আসছে নাকি বাইরে যাচ্ছে? ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলায় চালু ছিলাম। এখন মনে করবার চেষ্টা করছি খেলার কায়দাটা কী ছিল। সত্যি সত্যি লুকোতে হবে আমাকে। এবং ব্যাপারটা খেলা নয়।

গাছগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস শনশন করে বইছে। গাছ-জন্তুগুলো মাথা নুইয়ে কাকে যেন দেখবার চেষ্টা করছে। আমার মত ছোট কাউকে কি দেখছে?

বাতাসের দোলায় দুলছে ভালুকের থাবা। হঠাৎ একটা আলো ঝলসে উঠল। কার যেন হাসির শব্দ পেলাম।

'এদিকে এসো!'

কানা ভূতের মত ঘুরে মরছে আলোটা। চোখ পিটপিট করে ভালমত দেখবার চেষ্টা করলাম।

'বেলচাগুলো দাও। উফ! আমার পায়ের উপর ফেলতে বলেছি?'

আরেকটা আলো জ্বলে উঠল। এবার তার আভায় তিনটে ছেলেকে দেখতে পেলাম, প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বড়। এপাড়াতে আড্ডা দিতে দেখেছি ওদেরকে।

শেডের ভিতরে ঘাপটি মেরে বসে আছি, আলোর নাগালের বাইরে।

'খুব তো বলেছ ইয়ার্ড পরিষ্কার করবে। এখন দেখা যাবে!' সবচেয়ে বড় ছেলেটি বলল; ফ্ল্যাশলাইটটা উঁচিয়ে ধরল। হাসাহাসি শুরু করল ওরা।

অপর দু'জনের হাতেও বেলচা। একজন সরে গেছে আলোর কাছ থেকে। মাটি খুঁড়বার শব্দ পেলাম। অন্য ছেলেটি চারপাশের প্ল্যান্টগুলোকে দেখছে।

'অ্যাই, ড্যানি, আমার মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না…'

যে ছেলেটি কথা বলেছে তার কাঁধে ড্যানি, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ছেলেটির থাবা পড়ল সশব্দে।

'ভয় পাচ্ছ, ডরপুক কাঁহাকা?'

কাঁধ ডলে ঘাড় নাড়ল ছেলেটি। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কেটে পড়বার লক্ষণ দেখাল না। হেসে উঠল ড্যানি। মাটিতে ফ্ল্যাশলাইট নামিয়ে রেখে মিশে গেল আঁধারে।

এখন আর ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না, তবে কানে আসছে খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ। কী করছে ওরা? কোন কিছু কি মাটিতে পুঁতছে? নাকি কিছু খুঁড়ে তুলছে?

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ওরা যদি প্ল্যান্টগুলোকে খুঁড়ে তুলে ফেলে?

মনে সাহস জড় করে, শেড ত্যাগ করতে বেশ খানিকক্ষণ লেগে গেল আমার। ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু প্ল্যান্ট খুঁড়ছে এই দুশ্চিন্তায় না বেরিয়ে উপায় থাকল না। কেন যে এতখানি উদ্বেগ বোধ করছি কে জানে। কিন্তু করছি। আমি মনে প্রাণে চাই গাছ-জন্তুগুলোর শিকড় শক্তভাবে মাটির গভীরে গাঁথা থাকুক।

বুড়ো মানুষটার জন্য মায়া হচ্ছে। বেচারী বাড়ি ফিরে এসে যখন দেখবেন তাঁর ইয়ার্ড ফাঁকা হয়ে গেছে, কেমন লাগবে? আঘাত সইতে না পেরে আবার যদি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়?

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম। গাছ-জন্তুদের কাছ ঘেঁষতে চাইছি না, আবার ড্যানির রেখে যাওয়া ফ্ল্যাশলাইটের আলোও এড়াতে হচ্ছে।

কুৎসিৎ এক শব্দ কানে এল এবার।

গাছ কাটবার।

জমে গেলাম। কাঠের গায়ে গেঁথে যাচ্ছে কুঠার। ঠক-ঠক-ঠক। বাতাস গতি বাড়িয়েছে, আমার আশপাশের প্ল্যান্টগুলোকে দুলুনি দিয়ে যাচ্ছে।

শিউরে উঠলাম আমিও। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনমতে ঢোক গিলে সটান উঠে দাঁড়ালাম।

কাউকে না কাউকে কাজটায় বাধা দিতে হবে। এবং এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে?

আগে বেড়ে আমার ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বাললাম। আলোটা ইতস্তত ঘুরে ভালুকের নতুন গজানো শিং, সিংহের বাড়তি লেজ আর ড্রাগনের বাঁকা পিঠ ফুটিয়ে তুলল।

কুঠারের শব্দ থেমে নেই। ছেলেগুলো হাসাহাসি করছে। গাছ থেকে গাছে, টপিয়ারি থেকে টপিয়ারিতে, ছায়াশ্বাপদ থেকে ছায়াশ্বাপদের কাছ অবধি পৌঁছে

যাচ্ছে ওদের হাসির শব্দ।

ছেলে তিনটে যেন সবখানে ছড়িয়ে গেছে–কাটছে, খুঁড়ছে। মনটা তেতো হয়ে গেল আমার। সহসা তীব্র ঘৃণা অনুভব করলাম ওদের প্রতি।

'অ্যাই!' নিজের চিৎকারে নিজেই প্রায় ঘাবড়ে গেলাম। 'অ্যাই! থামাও এসব!'

আঁধার ফুঁড়ে দেখা দিল একটা মুখ।

আলো ফেললাম সরাসরি মুখটার উপর। ড্যানি। বিশালদেহী ছেলেটির মাথায় কমলা রঙের চুল। চোখ দুটো হলদে। চিড়িয়াখানায় দেখা সিংহের সঙ্গে অসম্ভব মিল রয়েছে ওর চোখ দুটোর। ভয়-ভীতির লেশমাত্র নেই।

অপর ছেলে দুটি ড্যানির পিছনে এসে দাঁড়াল। পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল ওরা। বেলচায় ধুলো-মাটি লেগে রয়েছে। ড্যানির হাতে কুঠার।

'কী চাই তোমার?' বাজখাঁই কণ্ঠে জবাব চাইল।

'এই মুহূর্তে বাড়ি চলে যাও। তোমাকে এখানে আর এক মুহূর্ত দেখতে চাই না আমি,' পাল্টা চিৎকার ছেড়ে বলতে চাইলাম। কিন্তু মুখে কথাগুলো জোগাল না। ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে মিনমিন করে বললাম, 'এটা তোমাদের ইয়ার্ড নয়।' আশা করলাম যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো আওড়াতে পেরেছি।

'তোমার বুঝি?' ড্যানি বাঁকা হেসে বলল।

পরমুহূর্তে আমাকে জোরে এক ধাক্কা দিল কাঁধে। টলমল পায়ে পিছু হটতে বাধ্য হলাম। আমার পায়ে বাড়ি খেল ওর ফ্ল্যাশলাইটটা। গড়িয়ে গেল ঘাসের উপর দিয়ে। ভুতুড়ে ছায়া খেলে গেল গাছগুলোর গায়ে।

'কী হলো, কথা বলছ না কেন? এটা তোমার ইয়ার্ড?'

'তোমরা এখানে এসেছ কেন?' অন্য কিছু বলবার চেষ্টা করলাম। 'এখনই যদি এসব অকাজ বন্ধ না করো তা হলে কিন্তু বাড়ির মালিককে বলে দেব।'

হা-হা করে হেসে উঠল ড্যানি।

'উরিব্বাবা, সত্যি বলছি ভীষণ ভয় পেয়েছি। তোমরা পাওনি?' বন্ধুদের উদ্দেশে ঘুরে তাকিয়ে জানতে চাইল।

ছেলে দুটি কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল। ভাবখানা এমন যেন কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে। চোখ-মুখ ফ্যাকাসে।

'কুকুরের একদিন কী আমার একদিন,' অনুচ্চস্বরে আওড়াচ্ছে ড্যানি। বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি নেই ওর। 'সেদিন বাগান থেকে বল নিতে এসে কী অপমানটাই না হলাম! ওর সাধের বাগান তছনছ করে তবে আমার শান্তি।'

'আমি বলে দিচ্ছি…' শুরু করলাম।

ড্যানি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েই ঘুসি মারল আমার কাঁধে। মাটিতে ছিটকে পড়ে গেলাম। পরক্ষণে উঠে দাঁড়ালাম। সামনে বেড়ে ঘুসি ঝাড়লাম ওর চোয়াল লক্ষ্য করে। বাতাসের গর্জন কানে বাজল এসময়। মনে হলো পাতায় চাবুক হেনেছে। ঘোঁত করে উঠে আবার হাত চালালাম। কাঁপুনি উঠল পাতায়। আমার ঘুসিগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ডালে-ডালে ঠোকাঠুকির শব্দ শুনলাম।

পরমুহূর্তে, ড্যানি আর্তচিৎকার ছেড়ে চিতিয়ে পড়ে গেল।

আঁধারে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। আমার ফ্ল্যাশলাইটটার মাথা নিচুতে আর ড্যানিরটা তাক হয়ে রয়েছে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে। ড্যানির গায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। খালি হাতটা মুঠো পাকিয়ে রেখেছি।

এক গড়ান দিল ড্যানি। কাঁদছে। ওর মুখে তিনটে দগদগে গভীর কাটা দাগ। আমার মুঠোটা এক নজর দেখলাম। অসম্ভব, এটা আমার কাজ নয়। নিমেষে গা-হাত-পা হিম হয়ে এল।

পাতাগুলো খস-খস শব্দ করছে, অথচ আমার মাথার একটা চুলও নড়ছে না। মুখ তুলে চাইলাম। বাতাসের ছিটেফোঁটাও টের পেলাম না।

ওদিকে পাতার অনবরত খসখসানি চলছেই।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি শব্দ লক্ষ্য করে। আমাকে যেন কেউ বাধ্য করল ওদিকে তাকাতে। অনেকক্ষণ দৌড়ে এলে যেমন হয়, বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

কোমর মুচড়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, দু'পা যেন নেবে গেছে মাটির গভীরে। মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন দেখে ছুটে পালাতে চাইছি। যতই প্রাণপণ চেষ্টা করছি, ক্রমেই মন্থর হচ্ছে গতি।

ড্যানির ফ্ল্যাশলাইট তখনও পড়ে রয়েছে এক পাশে কাত হয়ে। ওটার আলোয় দেখতে পেলাম ওর সঙ্গীরা শিকড় উপড়ে ফেলেছে কয়েকটা ঝোপের। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকের মধ্যে। ভালুক-গাছটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এখন বড় বড় দুটো গর্ত। গাছটার তো মাটিতে পড়ে থাকবার কথা। নেই।

মুখ তুলে চাইলাম।

জমির উপর যখন দাঁড়িয়ে ছিল তার চাইতে অনেকখানি লম্বা দেখাচ্ছে এখন।

হাড়সর্বস্ব আঙুল থেকে টপটপ করে যেভাবে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ে, সেভাবে মাটি ঝুরঝুর করে পড়ছে বাঁকা-নগ্ন শিকড়-বাকড় থেকে। ওটা এমনভাবে দুলছে যেন জোর হাওয়া বইছে। অথচ কোথায় বাতাস? কাঠের কোকানি আর

পাতার কাঁপুনি তুলে এগোচ্ছে ওটা। ধীরেসুস্থে মাথা উঁচু করল।

চোখের জায়গায় কালো কোটর। ছোঁক-ছোঁক শব্দ করে নাকটা বাড়িয়ে দিল।

মুখ হাঁ হয়ে গেল আমার।

স্বর ফুটল না গলায়।

কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখজোড়া।

ভালুক-গাছটা বাঁকা শিকড় ফেলে এক কদম আগে বাড়ল। দড়ি বেঁধে যেন টেনে তোলা হয়েছে, এমনিভাবে উঁচিয়ে রয়েছে পেল্লায় একটা থাবা। কিন্তু কোথায় দড়ি? নিজে নিজেই এগোচ্ছে ওটা। চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল নখরগুলো।

থাবাসদৃশ ডালটা এবার আমার গায়ের উপর পড়তে শুরু করল।

পাঁচ

আমি ছিটকে পড়লাম ড্যানির উপর। থাবাটা ঝপ করে নেমে এল। পাতাগুলো স্পর্শ করল জ্যাকেটটাকে, চিরে দিল।

পিছন থেকে অন্য ছেলে দুটির আর্তনাদ শুনতে পেলাম। ঝন-ঝনাৎ শব্দ করে বেলচা পড়ে গেল। মাটির উপরে স্নিকারের ধপ-ধপ আওয়াজ।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ড্যানির জ্যাকেটটা টেনে ধরে চিৎকার ছাড়লাম।

'কী করেছ দেখো!'

ড্যানি দেখাদেখির মধ্যে গেল না। সটান উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল গেট লক্ষ্য করে। পিছনে কীসের যেন শব্দ পেয়ে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম।

ওরা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে ডানাধারী সিংহটাকেও। ভারী ডাল-পালার মধ্যে মাথা ঘুরাচ্ছে ওটা। এবার গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল, টাম্বলউইড যেভাবে গড়ায় ঠিক তেমনিভাবে। প্রথমে একটা তারপর দুটো ডানাই ঝাপটে নিল। মাথাটা পিছনে ঝটকা মারল। গর্জন নয়, মনে হলো বাতাসে সজোরে কেউ বুঝি বিশটা চাবুক হেনেছে।

আত্মা শুকিয়ে গেল আমার। পড়িমরি দৌড় লাগালাম।

ওরা ভিতরে ঢুকবার সময় গেট লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন গেটের কাছে ভিড়

করে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করছে।

ড্যানি অন্যদেরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাতলটা চেপে ধরল। ছোট বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ও। ওর মুখের কাটা দাগ তিনটে দেখতে পাচ্ছি। লাল তিনটে লাইন। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিতে ওটা খুলে এল হাতে।

'দেয়াল বাও!' চেঁচিয়ে উঠলাম। পিছু ফিরে চাইলাম। টপিয়ারি নড়ছে-চড়ছে, হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। শত্রুদের ছাড়বে না ওরা।

বাতাসে সোঁদা গন্ধ। ডাল-পাতার খস-খস, কট-কট শুনতে পাচ্ছি। প্ল্যান্টগুলো ধীর গতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু ওরা অসম্ভব লম্বা যে!

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়াল বাইতে লাগলাম। আমি অর্ধেকটা উঠেছি, ওরা তখন দেয়ালের মাথায় চড়ে বসে আছে। এইমাত্র সাইডওয়কে কিঁচ্ করে উঠল একজনের স্নিকার। টপাটপ লাফিয়ে পড়ছে ওরা।

গালিগালাজের তুবড়ি ছুটিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। রাতের আঁধারে হারিয়ে গেল ওদের স্নিকারের শব্দ। আমি পড়ে রইলাম পিছনে। হাঁপাতে হাঁপাতে দেয়াল টপকাবার চেষ্টা করছি।

পাথরে ঘষা খেয়ে আঙুল ছড়ে গেল। পিছনে গাছগুলোর তাড়া করবার শব্দ। এবং তার চাইতেও ভীতিকর–ডানার ঝাপ্টানি।

ওটার ওড়া শিখতে কতক্ষণ লাগতে পারে?

আমাকে দেয়ালের উপর খুঁজে পেয়ে কি ছোঁ মেরে তুলে নেবে?

ডাল-পালার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে না তো?

দ্রুততর হলো আমার চড়াই বাওয়া।

পিছনে কী যেন চড়চড় করে ছিঁড়তে শুনলাম। ক্যাট ফুড নাকি? ওরা কি ওটা খুঁজে পেয়ে ব্যাগটা ছিঁড়ে ফেলছে? হয়তো বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

পরমুহূর্তে গোড়ালি চেপে ধরল কীসে যেন।

লাথি ঝাড়লাম, কিন্তু আবার চেপে ধরল। এমন শক্ত করে গোড়ালি ঠেসে ধরেছে, মোজাসুদ্ধ জুতো খুলে আসবে যেন। পায়ে খোঁচা লেগে জ্বালা করে উঠল। আবারও লাথি হাঁকাতে ছাড়া পেলাম।

এবার এক টানে শরীরটা তুলে নিলাম দেয়ালের মাথায়। দেয়াল ধরে ঝুলে পড়ে লাফ দিলাম নীচে।

মাটিতে পড়ে দুমড়েমুচড়ে গেলাম যেন।

সহসা বাহু চেপে ধরে টান দিল একজোড়া হাত।

ছয়

'উঠে পড়ো! জলদি! চলে এসো!'

মুসা আমার বাহু ধরে টানছে। কিশোর আর স্যালিকেও দেখতে পেলাম ওর সঙ্গে।

'আমাদেরকে ডাকোনি কেন?' গোয়েন্দাপ্রধান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'তোমরা সিনেমা দেখছিলে ডিস্টার্ব করতে চাইনি।'

স্যালির বাসার উদ্দেশে টলতে টলতে এগোলাম। সশব্দে দরজা লাগিয়ে দিল স্যালি। মেঝেতে বালির বস্তার মত ধপাস করে বসে পড়লাম।

আমার পাশে গুটিসুটি মেরে বসল স্যালি, চোখজোড়া বিস্ফারিত।

'আমি দেখেছি। ওদেরকে চলাফেরা করতে দেখেছি,' ফিসফিস করে বলল। 'তোমার বিপদ দেখে কিশোর আর মুসাকে ডাক দিয়ে এনেছি।'

বাসার মধ্যে অটুট নিস্তব্ধতা। গরম কুকি আর ডিনারের সুগন্ধ নাকে আসছে।

কিশোরের দিকে চাইলাম।

'ওরা গাছগুলোকে উপড়ে ফেলেছে,' শ্বাসের ফাঁকে কোনমতে বললাম। 'শুধু খোঁড়েনি, কেটেও নিয়েছে।'

স্যালি সভয়ে চাইল দরজার দিকে।

'ওরা জ্যান্ত, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালাম। উঠে দাঁড়িয়েছি কিন্তু জানালা দিয়ে তাকাতে চাইছি না। বন্ধ দরজার পিছনেই নিরাপদ বোধ করছি। আশা করি গাছগুলো দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

'ওরা জ্যান্ত। আর এখন তো আরও বিপদ। ওদেরকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

আমি খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর খাবার এনে দিল স্যালি। খেয়ে নিলাম। একটু পরে, তিন বন্ধু ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। যুম্যানের বাড়ি ঘেরা ধূসর দেয়ালের দিকে ভুলেও তাকালাম না। প্ল্যান্টগুলো মাথা দোলাচ্ছে এদৃশ্য দেখতে চাই না। ওরা দেয়ালের ওপাশেই থাকুক।

হঠাৎই ছানাধারী সিংহটার কথা মনে পড়ল।

পরদিন নাস্তার টেবিলে আমাকে দেখে জুলি খালা জানতে চাইলেন, শরীর ঠিক আছে কিনা। আমাকে নাকি ম্লান দেখাচ্ছে। বললাম, কোন সমস্যা নেই–ভাল আছি। ছড়ে যাওয়া হাত দুটো যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখলাম।

বন্ধুদেরকে গতরাতের ঘটনাটা সবিস্তারে বললাম।

'খাইছে! আরেকটু হলেই তো ধরে ফেলত তোমাকে,' মুসা মন্তব্য করল।

'খুব বাঁচা বেঁচে গেছ,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমরা তিনজন থাকলে ওরা গাছ কাটার সাহস পেত না,' মুসা জোর গলায় বলল।

হয়তো তাই। আমরা হয়তো বাধা দিতে পারতাম।

'যাকগে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর। 'এখন দেখা যাক ঘটনাটা কদ্দূর গড়ায়।'

বিকেলে স্যালির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা। বাসার বাইরে স্যাভলের উপর বসে ছিল ও।

'নতুন আর কিছুই ঘটেনি,' বলল। 'আচ্ছা, গাছগুলো কি চলে গেছে?' এগিয়ে এসে জানতে চাইল। যুম্যানের রহস্যময় বাড়িটার দিকে বারবার চাইছে। আমরাও। দেয়ালের ওপারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমনকী প্ল্যান্টগুলোর মাথা পর্যন্ত না।

শ্রাগ করলাম।

'কে জানে।'

'এখন আমাদের কী করা উচিত, কিশোর?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। দেয়ালটার দিকে চাইল।

'অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।'

এভাবে আরও চারটে দিন কেটে গেল। ইতোমধ্যে এ পাড়া থেকে একটা পুতুল আর একটা বেড়াল উধাও হয়েছে।

খালুর বিশ্বাস বন থেকে কয়োটিরা এসে হানা দিচ্ছে। কিন্তু কয়োটিরা গাড়ির টায়ার ফাঁসিয়ে দেবে কেন? ড্যানিরা যুম্যানের ইয়ার্ডে অপকর্ম করে আসবার পরের দিন সকালে দেখা যায়, স্যালিদের গাড়ির টায়ার চিরে ফালা-ফালা করে দিয়েছে কেউ। আর কয়োটিরা মানুষের বাসার দরজায় ইঞ্চিখানেক লম্বা আঁচড়ই বা কাটতে যাবে কোন্ দুঃখে? খালুর বাসার দরজায় আঁচড়ের দাগ দেখা গেছে। কয়োটির পাল মেটাল গার্বেজ ক্যান চিরে ভিতরের জিনিসও খেতে যাবে না।

অথচ কারা যেন খেয়েছে। গোটা রাস্তা জুড়ে সে রাতে এসব আশ্চর্য কাণ্ডই ঘটেছে।

পরদিন সকালে আমরা স্যালির সঙ্গে বসে ছিলাম ওদের বাসায়।

'ব্যাপারটা খারাপের দিকে যাচ্ছে,' চিন্তিত মুখে বলল কিশোর।

'মা তো আমাকে সন্ধ্যার পর বেরোতে বারণ করে দিয়েছে। মার ধারণা এটা খারাপ ছেলেদের কাজ।'

সোফার হাতলে কব্জি ঠুকলাম আমি।

'কী করা দরকার ফীল করছি আমি,' বললাম।

'কী?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল তিনজন।

বন্ধুদের দিকে চাইলাম।

'ওগুলোকে আবার পুঁততে হবে। আর খাওয়াতে হবে বোনমিল। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে আরেক বস্তা জোগাড় করে আনব।'

নাক কুঁচকাল স্যালি।

'গুঁড়োটা কি সত্যি সত্যি হাড় থেকে বানায়?' শিউরে উঠল ও।

শ্রাগ করলাম। 'কে জানে।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ,' সায় জানাল কিশোর। 'মানুষের কুকুর-বিড়াল হারানোটা ভাল কথা নয়।'

'ওরা হয়তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে,' বলল স্যালি।

মাথা ঝাঁকালাম। তাই যেন হয়। উঠে দাঁড়ালাম।

'আজকে ওদেরকে পুঁতব আমরা। সন্ধ্যার পর।'

স্যালিকে সাহায্য করবার কথা বললাম না। বেচারীকে খামোকা বিপদে জড়াতে চাই না। সে-ও মুখ ফুটে আমাদের দলে যোগ দেওয়ার কথা বলতে পারল না।

বিদায় নিয়ে আমরা তিন বন্ধু বাড়ি ফিরে চললাম।

স্যালিদের বাসার উপরে, সূর্য কমলালেবুর রং ধরলে বেরোলাম আমরা। মুসার হাতে খালুর বেলচাটা শোভা পাচ্ছে। গেট দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করলাম না আমরা। সে রাতে গেট খোলা যায়নি। কাজেই সুবিধাজনক জায়গা দিয়ে দেয়াল টপকাব ঠিক করেছি। আচ্ছা, হঠাৎই একটা চিন্তা ঘাই মারল আমার মাথায়। গাছগুলো কি গেট দিয়ে বেরিয়েছিল নাকি দেয়াল টপকে? নাকি পক্ষীরাজ সিংহটাই একা উড়ে

বেরিয়ে এসেছিল?

ঘটনা আরও পাকিয়ে উঠবার আগেই কাজে নামতে চেয়েছি আমরা। চাইনি আর কোন কুকুর-বেড়াল খোয়া যাক। তা ছাড়া, মনের মধ্যে আশঙ্কাও কাজ করেছে, এরপর হয়তো আরও বড় কিছুর উপর দৃষ্টি পড়বে গাছ-জন্তুগুলোর। তার আগেই এদের পেট ভরাবার কাজটা করতে হবে আমাদের।

বোনমিলের বস্তাটা ভয়ানক ভারী। ওটার গায়ে দড়ি পেঁচিয়েছি। মুসা টেনে তুলে নেবে দেয়ালের উপরে। বেলচাটা মুসা ছুঁড়ে মারল ওপারে। যেখানে খুশি পড়ুকগে। মুসা আগে দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে তিনজোড়া ওয়র্ক গ্লাভস কিনেছি। এর ফলে চড়াই বাওয়ার কাজটা খানিকটা সহজ হবে।

দেয়ালের মাথায় চড়ে বসে বস্তাটা টেনে তুলে নিল মুসা। ওপাশের মাটিতে বস্তা নামাতে সাহায্য করল দড়িটা। এবার লাফিয়ে পড়ল নীচে।

কিশোরও দেয়াল টপকে নেমে গেল ওপাশে।

এবার আমার পালা।

ইয়ার্ডটাকে দেখে মনে হলো কেউ যেন ট্রাক্টর চালিয়েছে এটার উপর দিয়ে। বিশাল সব গর্ত এখানে-ওখানে। গহ্বরগুলোর চারপাশে ঘাস মরে গেছে। প্ল্যান্টগুলো একপাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। সবুজ পাতাগুলো এখনও অবশ্য চকচক করছে। লক্ষ করলাম কাটা জায়গাটা থেকে সিংহ-গাছটার নতুন শিকড় গজাচ্ছে।

আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। যে গর্তগুলো রয়েছে সেগুলো খুঁড়তে শুরু করল মুসা। সবার আগে ভালুক গাছটাকে বসাতে চাই আমরা।

গর্ত খুঁড়বার পর ধরে রাখতে হলো গাছটাকে। আশা করছি ঘুমিয়ে রয়েছে ওটা। হঠাৎ করে জেগে উঠে চমকে দেবে না।

গাছটার শাখা-প্রশাখা মোচড় খাচ্ছে আমার হাতের মধ্যে। শ্লথ গতি, মোটা কেঁচোর মত পাক খাচ্ছে।

'খাইছে!' মুসা অস্ফুটে বলল।

এক লাফে পিছে সরে গেলাম, কিন্তু ওটা উঠে দাঁড়াল না। দস্তানা টেনেটুনে পরে চেপে ধরলাম আবার।

সাঙ্ঘাতিক ঘেন্না লাগছে আমার। গাছের মত নিথর নয় ওটা। গাছের মত লাগছেও না ওটার স্পর্শ। এরকম কোন কিছুতে আগে কখনও হাত ছোঁয়াইনি আমি। পাতাগুলো অদ্ভুত গন্ধ ছাড়ছে। ক্লজিটের ভিতর এরকম গন্ধ পাওয়া যায়।

গাছটার সঙ্গে যুঝছি, আমার জ্যাকেট আর জিন্স চিরে দিল ওটার ডাল। এবার কিশোরও হাত লাগাল আমার সঙ্গে। দু'জনে মিলে গর্তের মধ্যে বসালাম ওটাকে। বেলচা মেরে মাটি ভরাট করছে মুসা।

একটু পরে অন্যগুলোর দিকে মন দিলাম।

আকাশের দিকে বারবার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। যুম্যানের ইয়ার্ডে দ্রুত আঁধার ঘনাচ্ছে। দেয়ালের নীচ দিয়ে যেন গুড়ি মেরে ইয়ার্ডে প্রবেশ করছে অন্ধকার। এখানে আরেকবার আটকা পড়বার কোন ইচ্ছে নেই আমার।

'হাত চলতে চাইছে না আর,' বলল কিশোর। সমানে কাজ করে চলেছি তিন বন্ধু। ঘেমে নেয়ে গেছি।

'উহ, হাত ব্যথা হয়ে গেছে,' বলল মুসা।

'আর একটু,' সান্ত্বনা দিলাম আমি।

সিংহটা বাদে আর সব প্ল্যান্ট যখন পোঁতা হয়ে গেল তখন রাত নেমেছে। সিংহ-গাছটাকে সবার শেষে ধরলাম। বারবার মনে হচ্ছে নড়াচড়া করছে ওটা। কাজ থামিয়ে, দম চেপে রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকছি। যখন নিশ্চিত হচ্ছি গাছটা স্থির রয়েছে, দ্বিগুণ দ্রুততার সঙ্গে কাজ সারবার চেষ্টা করছি। ড্যানি যেহেতু গাছটার পাগুলো কেটে দিয়েছিল, আমাদেরকে নতুন এক গর্ত খুঁড়তে হলো।

ইতোমধ্যে বাতাসের বেগ বেড়েছে। পাতাগুলো যখনই নাড়া খাচ্ছে বাতাসে, আঁতকে-আঁতকে উঠছি। মুখে পাতার ঘষা লাগলে হাত ঝটকাচ্ছি।

বাতাসের দোলায় মড়ার হাড়ের মত আমাদের দিকে তেড়ে আসছে ডাল-পালা। আর গলার কাছে উঠে আসছে আমার হৃৎপিণ্ড।

হয়ে এসেছে প্রায়, নিজেকে প্রবোধ দিলাম।

পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। সিধে হয়ে দাঁড়ালাম। গ্লাভস খুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। ঈষৎ লালচে রঙ ধরছে। মৃদুমন্দ বাতাসে, পাতায় পাতায় ঘষা খেয়ে সর-সর শব্দ তুলছে প্ল্যান্টগুলো। ঠাণ্ডা লাগছে আমার। আচমকা বাতাস থেমে গেল।

কাঠ হয়ে গেলাম। উৎকর্ণ। খসখস শব্দ পেলাম কি? কিছু কি নড়ে উঠল? বাতাস ছাড়াই কি দুলে উঠল কিছু? বন্ধুরাও আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

ঢোক গিললাম, কিন্তু গলাটা শুকনো ঠেকল। দেয়ালের দিকে চাউনি বুলিয়ে নিলাম। সময় মত ও পর্যন্ত পৌঁছতে পারব তো?

আচমকা আমার কাঁধে আঙুলগুলো চেপে বসল।

সাত

আর্তচিৎকার ছেড়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। বোনমিলের বস্তায় হোঁচট খেয়ে ঘাসের উপর পড়ে গেলাম।

এক লাফে পিছু হটল স্যালি।

কিশোর আর মুসা হো-হো করে হেসে উঠল। ওরা স্যালিকে আসতে দেখেছে। আমাকে বলেনি। আমার ভড়কানিটা খুব উপভোগ করেছে দু'জনে।

উঠে বসে কটমট করে চাইলাম ওর দিকে।

'তুমি এখানে কী করছ?'

চারধারে আতঙ্কমাখা চোখ দুটো বুলিয়ে নিল মেয়েটি।

'সাহায্য করতে এলাম। তোমাদের অনেক সময় লেগে যাচ্ছে দেখে। আঁধার হয়ে গেছে তো।'

উঠে দাঁড়িয়ে বোনমিলের বস্তাটা তুলে নিলাম।

'হুঁ, জানি। এখন এটা শুধু ছড়িয়ে দেয়া বাকি।'

নাক কুঁচকালেও হাত পাতল স্যালি। বস্তার মুখ খুলে সবার হাতে খানিকটা করে হাড়ের গুঁড়ো তুলে দিলাম। স্যালি গাছগুলোর কাছে গেল না। ফুট তিনেক দূরে থেকেই ছুঁড়ে দিল গোড়া লক্ষ্য করে।

'কতখানি গভীর করে পুঁতেছ?' জিজ্ঞেস করল। বোনমিলের জন্য হাত পেতেছে আবার। 'মা তো দু'ফুট গভীরে বাল্ব পোঁতে।'

ভ্রূ কুঁচকাল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমরা তারচেয়ে নীচে পুঁতেছি।'

বাতাস গতি পেয়েছে, ফলে প্ল্যান্টগুলোর মধ্যে শিহরণ দেখা গেল।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল স্যালি।

'কীসের শব্দ?'

'বাতাস। এসো, সিংহটাকে খাবার দিতে হবে,' বলল মুসা।

গাছটার কাছে যখন পৌঁছলাম রীতিমত কাঁপছে স্যালি। আমার অবস্থাও তথৈবচ। অবশ্য প্রকাশ করলাম না।

বোনমিলের বেশিরভাগটুকু শেষ। আমাদের কাপড়-চোপড়ে লেগে অনেকটা

নষ্ট হয়েছে। চকের গুঁড়োর মত সব জায়গায় লেগে যায় জিনিসটা।

এক মুঠো গুঁড়ো সিংহটার দিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। নতুন খোঁড়া গর্তে বাঁকা ক্রিসমাস ট্রীর মত দাঁড়িয়ে ওটা। পার্থক্য একটাই, অন্য কোন গাছকে কোনদিন এতটা ভীতিকর দেখায়নি আমার চোখে।

কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদের কাজ-কর্ম পছন্দ করতে পারছে না ওটা। বুকের মধ্যে ভয় জাঁকিয়ে বসছে।

'যাবে এখন?' ফিসফিস করে বলল স্যালি।

মাথা ঝাঁকালাম। অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে আসছে। কে যেন গোপনে লক্ষ করছে।

দৌড়ে গেলাম দড়িটা যেখানে রেখে এসেছি। খালুর বেলচাটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে মুসা স্যালির উদ্দেশে বলল, 'দড়ি বেয়ে উঠে ওপাশে নেমে যাও। আমি ধরে থাকব।'

মাথা নেড়ে বাইতে শুরু করল ও।

ঝানু দড়াবাজ বলবার উপায় নেই ওকে। উৎসাহ জোগাতে হলো আমার। বহুক্ষণ লেগে গেল ওর দেয়ালের মাথায় পৌছতে। ইতোমধ্যে ঝুপ করে কাকের ডানার মত আঁধার নেমেছে চারপাশে।

পিঠ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে আমার। জ্যাকেটের ভিতরে ভয়ানক গরম।

মুসা গায়ের জোরে দড়ি টেনে ধরে রেখেছিল। স্যালিকে হড়কে নেমে যেতে বলল ওপারে। ও নেমে গেলে ঢিল পড়ল রশিতে।

পিছনে এসময় পাতার ঘর্ষণ শুনতে পেলাম। শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ।

'খাইছে!' মুসাও শুনতে পেয়ে পিছু ফিরে চেয়েছে।

ইয়ার্ডে জমাট অন্ধকার এমুহূর্তে। তারার আলোয় আঁধার কাটেনি। খস-খস! পর মুহূর্তে বিদঘুটে এক ফোঁসফোঁসানির শব্দ।

বোনমিলের বস্তাটার দিকে চাইলাম।

'শক্ত করে দড়ি ধরে থাকো,' মুসা চেঁচাল স্যালির উদ্দেশে। পিছনে অদ্ভুত শব্দটা থেমে গেছে। 'রবিন, উঠে পড়ো।'

আমার ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। যত দ্রুত পারি উঠবার চেষ্টা করছি দড়ি বেয়ে। উপরে পৌছে কিছুক্ষণের জন্য থমকালাম। গাছগুলো জমি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে না তো?

'রবিন?' স্যালি শুকনো, ভয়ার্ত গলায় ডাকল।

ওকে চুপ করতে বলে কান পাতলাম। শোঁ-শোঁ শব্দটা জোরদার হয়েছে।

চারদিক থেকে আসছে বলে মনে হলো। মিটমিট করে জ্বলে উঠল স্ট্রীটলাইট। এবার ভাল করে দৃষ্টিগোচর হলো বিষয়টা।

গাছ-জন্তুগুলোকে কেউ যেন এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছে। কালিগোলা অন্ধকার জমিতে দৃষ্টি দিলাম। গাছগুলোকে ঠিক মত পুঁততে পারিনি। শিকড়সুদ্ধ উঠে আসবার চেষ্টা করছে ওরা। সেজন্যই ওই ফোঁস-ফোঁসানির শব্দটা পাচ্ছিলাম। এবার সেটা বন্ধ হলো।

'কী হচ্ছে কী ওখানে?' স্যালি প্রশ্ন করল। 'তোমার বন্ধুরা উঠছে না কেন?'

দেয়াল বেয়ে নামতে লাগলাম আমি। মাটিতে নামবার পর শরীর ছেড়ে দিল। ক্লান্তিতে ঢলে পড়লাম। 'এখন কাজ হলেই বাঁচি।'

একটু পরেই কিশোর আর মুসা একে একে নেমে এল এ পাশে।

হাসি ফুটেছিল স্যালির মুখে। কী দেখে যেন সহসা মুছে গেল। 'ও' হয়ে গেছে মুখটা।

আমরাও মুখ তুলে তাকালাম।

দেয়ালের মাথার কাছে ঘাপটি মেরে রয়েছে বাঘ-গাছটা। থাবায় লেগে রয়েছে তাজা মাটি। তারমানে যথেষ্ট গভীরে আমরা ওটাকে পুঁততে পারিনি! গাছটা মুক্ত করে নিয়েছে নিজেকে। মাথা দুলাচ্ছে দু'পাশে, কাঠের গোঙানির শব্দ উঠছে তার ফলে। ওটার বেড়ে ওঠা নখর তীক্ষ্ণ আঁচড় কাটছে দেয়ালে।

স্যালির হাত চেপে ধরে দেয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর এক হাতে ওকে টানতে টানতে গুড়ি মেরে এগোতে লাগলাম।

ছোঁক-ছোঁক শব্দ করছে ওটা। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

স্যালির দিকে চাইলাম। গাছটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

'ওদিকে চেয়ো না,' বললাম।

'রবিন, বাসায় চলো,' ফিসফিস করে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। ও আর মুসাও গুড়ি মেরে এগোচ্ছে।

দেয়ালের উপরদিকে পাতা ঘষা খাচ্ছে। পরমুহূর্তে ফুটপাতের উপর পতনের ঝম-ঝম শব্দ।

ইয়ার্ডের এপারে লাফিয়ে নেমে পড়েছে ওটা।

স্যালির হাত আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালাম আমি এবং ঝেড়ে দৌড় দিলাম। পিছনে বাঘ-গাছটা ফোঁস-ফোঁস করে তেড়ে আসছে।

কীসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম।

'থেমো না,' চেঁচালাম বন্ধুদের উদ্দেশে। উঠে দাঁড়িয়ে তুলে নিলাম যেটায়

হোঁচট খেয়েছি। খালুর বেলচাটা। ক্রিকেট ব্যাটের মত দু'হাতে চেপে ধরলাম ওটাকে। তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম।

পাতার শব্দ তুলে ধেয়ে আসছে গাছটা। যথাসম্ভব দেরি করলাম। তারপর বাগে পেয়ে, ধাঁই করে পুল শট খেলবার মত করে চালিয়ে দিলাম বেলচা।

মাথা নোয়ানো ছিল, ফলে চমৎকার সংযোগ হলো বাঘের মুখের সঙ্গে। ক্রিকেট বল হলে সীমানার বাইরে উড়ে যেত ডীপ মিড উইকেট দিয়ে। কিন্তু এটার শুধু একটা বাঁকানো দাঁত খসে পড়ল।

মট করে ডাল ভাঙল। খস-খস শব্দ তুলে টলমল পায়ে পিছু হটল শত্রু। বেলচাটা ছুঁড়ে মারলাম ওটাকে লক্ষ্য করে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুট দিলাম খিড়কি দরজার উদ্দেশে।

স্যালি আর মুসা ভিতরে আগেই ঢুকে পড়েছে। কিশোর আমার জন্য আলতো ফাঁক করে ধরে রেখেছিল দরজাটা।

'জলদি!' হিসিয়ে উঠল।

এক দৌড়ে ভিতরে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। বাইরে ওটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দরজায় আঁচড় কাটছে ডাল-পালা। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। মনে হচ্ছে একটা সাইক্লোন বুঝি ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে।

জুলি খালা এসময় কিচেনে এসে অবাক চোখে আমাদের দিকে চাইলেন। স্যালিকে দেখে হাসি ফুটল ওঁর মুখে।

'আরে, কী ব্যাপার, তুমি? ও, রবিনদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল স্যালি।

'খুব ভাল। অ্যাই, তোদের কাপড়-চোপড় এত ময়লা হলো কী করে রে? কাদা ঘেঁটেছিস নাকি? যা, এক্ষুনি ওয়াশিং মেশিনে রেখে আয়।...কী বাতাসটাই না দিচ্ছে, বাপরে! মনে হচ্ছে গাছগুলোও ফোঁস-ফোঁস করছে।...স্যালি, ডিনার করে যাবে কিন্তু।'

'উনি ওদিকটায় আছেন,' স্যালিকে বললাম আমি। ওকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছি আমরা। হলঘর ফাঁকা রয়েছে দেখে নিয়ে চারজনে পা চালালাম যুম্যানের রুম লক্ষ্য করে।

'উনি কি বলতে পারবেন কীভাবে ওগুলোর হাত থেকে বাঁচা যায়?' প্রশ্ন করল স্যালি। ফ্যাকাসে সবুজ দেয়ালে লটকানো ছবিগুলো দেখছে।

'প্ল্যান্টগুলো তো ওঁরই,' বলল কিশোর।

'তা হলে উনি কেন তাড়ালেন না?'

'চাননি হয়তো,' বলল কিশোর।

'কিংবা হয়তো অসুস্থ বলে পারেননি,' যোগ করল মুসা। 'অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন উনি।'

'এখন একটু চুপ করো,' বললাম আমি।

ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে চাইল ও। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

যুম্যানের কামরায় মাথা গলিয়ে দিলাম। তারপর হাতছানি দিয়ে বন্ধুদেরকে ডেকে পা রাখলাম ভিতরে।

জানালার পর্দা সরানো। বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়সারি আর পাইন গাছের জটলা দেখতে পাচ্ছি। বুড়ো মানুষটার কাছে হেঁটে গেলাম।

বুড়োর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। আশা করছি উনি চোখ মেলে চাইবেন। আমাদেরকে অজানা কিছু জানাবেন।

'তোমরা কী করছ এখানে!'

চমকে উঠলাম। ঘুরে দাঁড়ালাম চরকির মত। সেদিনের সেই নার্স জ্বলন্ত চোখে আমাদের দিকে চেয়ে।

'আ-আমরা...' তো-তো করে বলতে গেল মুসা।

সামনে এগিয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমরা ওঁর পাশের বাসায় থাকি। উনি কি শীঘ্রি সেরে উঠবেন?'

নার্সের চোখের দৃষ্টি খানিকটা নরম হলো।

'সরি। উনি কাল রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেক বেশি অসুস্থ।'

আমার দিকে চাইল বন্ধুরা।

'ধন্যবাদ। এসো,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর। তারপর কী মনে করে ঘুরে দাঁড়াল। 'উম, উনি কি ওঁর পোষা জন্তুর সম্পর্কে কিছু বলেছেন?'

মাথা নেড়ে যুম্যানের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন নার্স।

'কই না তো। তবে কী যেন একটা কাজ করে দিতে বলছিলেন। বেচারী বুড়ো মানুষ। বলছিলেন, আমি কি এক জায়গায় যেতে পারব?–কোথায় তা অবশ্য বলতে পারেননি।'

হাসপাতালের বাইরে এসে জ্যাকেটের চেন টানলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

পকেটে হাত ভরে হাঁটা দিয়েছি, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের দিকে ফিরে চাইলাম। হাসপাতাল-বিল্ডিঙের বেশ খানিকটা পিছনে যেন আকাশ ছুঁয়েছে গাছ-পালার সারি।

বুড়ো কোথায় পাঠাতে চাইছিলেন নার্সকে?

গাছগুলোর দিকে আরেকবার দৃষ্টি বুলালাম। তারপর খপ করে কিশোরের বাহু চেপে ধরে, আমার দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিলাম। 'তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি যাব আর আসব।' বলেই সোজা আবার হাসপাতালের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। আলগোছে চলে এলাম বৃদ্ধের কেবিনে। ঘরে কেউ নেই। 'ওরা…ওরা মানুষ মারতে শুরু করবে,' বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন বৃদ্ধ। ওঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম।

'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' বললাম।

ঘোলাটে চোখ মেলে চাইলেন উনি। 'গাছগুলোকে জঙ্গলে নিয়ে যাও,' অস্পষ্ট কণ্ঠে আওড়ালেন। 'বাঁচার…এটাই…একমাত্র…পথ।… আমি ভুল করেছি। আমার…গাছ নিয়ে গবেষণা…করা…ঠিক… হয়নি। ওরা…হিংস্র হয়ে উঠবে জানলে…' হঠাৎই কথা বন্ধ হয়ে গেল ওঁর। ঘুমিয়ে পড়েছেন।

যা বুঝবার বোঝা হয়ে গেছে আমার। ফিরে এলাম বন্ধুদের কাছে।

'বুঝেছি। উনি কী চাইছিলেন বুঝতে পেরেছি! কিন্তু আমরা কীভাবে…আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক কয়োটিদের মত। উনি পারবেন না, কিন্তু আমরা হয়তো পারব!'

'কী পারব?' মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

ওদেরকে খুলে বললাম বৃদ্ধের কাছ থেকে শুনে আসা সব কথা।

'রবিন বলতে চাইছে, কয়োটিরা জোড় বেঁধে শিকার করে,' সব শুনে বলল কিশোর। 'একটা বিপদে পড়লে আরেকটা সাহায্য করে। আক্রমণ এলে একটা লুকায় আরেকটা দৌড় দেয়। শিকারী তখন ওটার পিছু নেয়। ফলে কোনটাই সেভাবে ক্লান্ত হয় না কিংবা ধরা পড়ে না।'

'তুমি কয়োটি ধরবে নাকি?' স্যালি জিজ্ঞেস করল।

'ধরব না, সাজব। দু'জোড়া কয়োটি। অবশ্য তুমি যদি সাহায্য করো তবেই।'

স্যালিকে খুশি দেখাল না। পাইন সারির উদ্দেশে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। এবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ঘাড় কাত করল। 'আচ্ছা।'

আমার কথা মত স্যালি আর মুসা যুম্যানের ইয়ার্ডের গেট খুলবার কাজে লাগল। আমি আর কিশোর হার্ডওয়্যার স্টোরে গেলাম, নতুন একটা ব্যাকপ্যাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে।

ফিরে যখন এলাম, ওরা ততক্ষণে হাতুড়ি দিয়ে গেটের লক ভেঙে ফেলেছে। ঘড়ি দেখলাম। পাঁচটা চার।

'তোমার বাবা-মা তোমাকে খোঁজাখুঁজি করবেন না তো?' কিশোর প্রশ্ন করল স্যালিকে।

মাথা নাড়ল ও।

'ওঁদেরকে বলতে মানা করছ?'

'হ্যাঁ। আমরা তো বলতে পারি না যে, টপিয়ারিগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো যাতে কাউকে খেয়ে ফেলতে না পারে। আর বললেই বা ওঁরা বিশ্বাস করবেন কেন?' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

নাক ঘষল স্যালি।

'তা ঠিক। কিন্তু ধরো যদি কাজ না হয়?'

'হতেই হবে!' জোর গলায় বললাম আমি। 'যুম্যান একথাটাই বলতে চাইছিলেন নার্সকে।'

ডিনারের পর বেরিয়ে পড়লাম তিন বন্ধু। জুলি খালাকে বলেছি ভিডিও গেম খেলতে যাচ্ছি। উনি বলেছেন নটার মধ্যে ফিরতে। আমি তো তার আগেই ফিরতে চাই। অবশ্য আদৌ ফেরা হবে কি না কে জানে।

যুম্যানের বাসার সামনে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলো স্যালি। গেট খুলে সাইডওয়কে বসে থাকলাম আমরা। অপেক্ষা করছি। কারও মুখে কথা জোগাচ্ছে না। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সবাই আমরা চিন্তিত। ব্যাকপ্যাকে দু'হাত রেখে বসে আছি আমি।

স্যালি মুখ তুলে চাইল।

'সূর্য ডুবছে।'

নীলচে-সাদা স্ট্রীট লাইট দপ-দপ করে জ্বলে উঠল। তেমন একটা উজ্জ্বল নয় ওটা। আঁধারের পটভূমিতে মিটমিট করে জ্বলছে নক্ষত্র। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি সুইচ টিপে অন করে দিয়েছে।

এ সময় কানে এল শব্দটা। মর্মর ধ্বনি। সরসর করে ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল আমার। বাতাসে মৃদু দোলা খেল স্যালির কালো চুল–এবং আরও কী যেন।

চারজনেই সটান উঠে দাঁড়ালাম।

'রেডি?' প্রশ্ন করল কিশোর।

খোলা গেটের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়লাম।

হঠাৎই গেটের কাছে নড়ে উঠতে দেখা গেল একটা ছায়া-শরীর।

আট

যা ভেবেছিলাম তার চাইতে দ্রুত হানা দিল ওটা। ডাল-পাতার শব্দ তুলে বেরিয়ে এল। মনে করেছিলাম ভালুকটা, কিন্তু এত বেশি শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে ওটা থেকে–চিনতে পারলাম না।

'দৌড় দাও!' গর্জে উঠলাম।

রাস্তার দু'দিকে দু'ভাগ হয়ে দৌড় দিলাম আমরা চারজনে।

বেশি জোরে ছুটতে পারছি না। তাড়া করে আসছে গাছটা। ব্যাকপ্যাকটা বইতে হচ্ছে বলে মন্থর হয়ে পড়ছি আমি। এরই ফাঁকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করে নিলাম। ঠোঙায় ফুটো করে বোনমিল ছড়াতে ছড়াতে ছুটছি।

প্রথম মোড়টায় এসে থামলাম আমরা। হাঁটুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ফুসফুসে বাতাসের ধারাল খোঁচা। 'ওরা আসছে?'

আশপাশে জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার পরপরই চারপাশ সুনসান হয়ে যায়।

স্যালি মাথা নেড়ে আঙুল তাক করল।

বাতাসে দুলতে দুলতে ভেসে আসছে যেন। পাশের বাড়ির লন আর ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আকৃতিগুলো। ফুটপাতে ডালের খটাখট শব্দ।

'এসো,' বলেই দৌড় দেওয়ার জন্য ঘুরল কিশোর।

হাসপাতালের অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল স্যালি।

'খাইছে! থেমো না,' মুসা পিছু ফিরে চেঁচাল ওর উদ্দেশে।

কিন্তু ও কাজটাই করল স্যালি। পিছনে এক ঝলক চেয়ে বসে পড়ল সাইডওয়কে। আমি দৌড়ে গেলাম ওর কাছে।

'উঠে পড়ো। এখানে বসে থাকলে মরবে।'

মাথা নেড়ে হাঁপাতে লাগল ও।

'আর...দৌড়তে...পারব...না...'

'তা হলে ওই বারান্দাটায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকোগে যাও। ওরা পার হয়ে

গেলে হাসপাতালে চলে যেয়ো, কেমন?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ও। তারপর কোনমতে শরীরটা টেনে-হিঁচড়ে আমার দেখিয়ে দেওয়া বাড়িটার উদ্দেশে এগোল।

সাইডওয়কে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা তিনজন, চোখ-কান খোলা রেখে। স্ট্রীটলাইটের আলোর নীচে ক্রমেই সরু আর লম্বা হচ্ছে আমাদের ছায়া। পিছনে খস-খস আওয়াজ উঠতে লাফিয়ে উঠলাম আমি। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা বেড়াল। পায়ে ধুপ-ধাপ শব্দ করে তাড়ালাম। ঘুরে যখন দাঁড়ালাম, চলন্ত কোন কিছু চোখে পড়ল না।

সবার আগে দেখল ওটাকে মুসা।

'রবিন, সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল।

বাতাসে চাবুক চালাবার মতন সাঁ করে একটা শব্দ। মাথা নোয়ালাম আমি। কীসে যেন থাবা মেরেছে আমার ব্যাকপ্যাকে। কাপড় ছিঁড়ে গেল ফড়-ফড় করে। মাটিতে পড়ে গেলাম। মুখে ঝাপ্টা মারল শীতল বাতাস। পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল। উপর দিকে তাকালাম।

অন্যান্য প্ল্যান্টগুলো দশ ফুট মত দূরে। দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে। পাতায়-পাতায় শিহরণ আর আলোর নাচন। সামনের পা আগে ফেলছে, তারপর পিছনের, আবার সামনের–এভাবে হেলেদুলে এগোচ্ছে ওরা। পাতাভরা মাথাগুলো দুলিয়ে ক্রমেই ধরে ফেলছে আমাকে।

তিন পর্যন্ত গুনলাম। ওদেরকে একেবারে কাছাকাছি পেতে হবে। আমি চাই না ওরা স্যালিকে দেখতে পাক।

বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আমার পাশে। বিপদে আমাকে একা ফেলে পালায়নি। ওরা জানে আমি কী চাইছি।

বুকের মধ্যে হাপরের বাড়ি। অসুস্থ বোধ করছি। অপেক্ষা করছি।

ভালুক-গাছটা যেই মাত্র ঝুঁকে পড়েছে আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে, ঘুরেই দিলাম দৌড়।

ধাওয়া করছে ওরা।

ছুটেই চলেছি তিন বন্ধু। বুকটা আরেকটু হলেই ফেটে যাবে যেন। যখন আর শ্বাস নিতে পারছি না তখন থামলাম। পিছনে ওদের অনুসরণের শব্দ ঠিকই শুনতে পাচ্ছি।

পিছনে বনভূমি নিয়ে দাঁড়ানো হাসপাতালটা আমার সামনে। পৌঁছে গেছি প্রায়, বললাম নিজেকে। এবার টলতে টলতে ছুট দিলাম আবার। বন্ধুরা আমার

চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

স্যালি কোথায়? ওর তো এসময় আশপাশে থাকবার কথা। ভয় পেয়ে পালিয়েছে নাকি?

একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে পার্কিং লটের চারধারে দৃষ্টি বুলালাম। ও থাকলে ওদিকেই থাকবে। আমার আর ছুটবার ক্ষমতা নেই। কিশোর আর মুসার উপর দায়িত্বটা চাপাতে হবে। গাছগুলোকে জঙ্গলে পৌছে দিক ওরা।

একটুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। শত্রুদের হাতে এখন ধরা পড়ে গেলেও করবার কিছু নেই আমার। ঝুঁকে, হাঁটুতে হাত রেখে হাঁসফাঁস করছি।

'রবিন?'

মুখ তুলে দেখি স্যালি। পেরেছে তা হলে! ঘুর পথে পৌছে গেছে।

হাতছানি দিয়ে মুসা আর কিশোরকে ডাকলাম।

'ওগুলোকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দাও,' বুক ভরে শ্বাস টেনে বললাম। 'যুম্যান ওকথাই বলতে চেয়েছিলেন···বন! বনে···যাও!'

ব্যাকপ্যাক হাতড়ে আরেকটা ঠোঙা ধরিয়ে দিলাম কিশোরের হাতে। আর একটা মাত্র রয়েছে।

'কোনটা যদি বেশি কাছে এসে পড়ে তা হলে ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে দৌড় দেবে,' বললাম।

গাড়িগুলোর পিছনে উবু হয়ে বসে পড়লাম আমি। মিনিট পাঁচেক, এরমধ্যেই আশা করছি দম ফিরে পাব।

ওদেরকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমি এ মুহূর্তে নিরুপায়।

লুকিয়ে বসে থাকা দৌড়বার চাইতেও খারাপ। এই মনে হচ্ছে পাতার আওয়াজ পেলাম, তো এই আবার ডাল ভাঙবার মট্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সবই কল্পনা। মনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছি ভালুকটা পৌছে গেছে গাড়ির কাছে। থাবার ঝটকা মারল বলে। দম ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পা কাঁপছে রীতিমত। বনভূমির দিকে এগোলাম।

গোল থালার মত চাঁদ উঠেছে পিছনে। ফুটপাতে নয়, মাটিতে ঘষা খেয়ে হড়কে গেল আমার পা। পাইন গাছ–ফিসফিসে শব্দ তোলা কালো গাছগুলো–আমার সামনে অন্ধকার এক দেয়াল খাড়া করে দিয়েছে। দিক, এরা যে তাড়া করছে না তাই যথেষ্ট।

ছুটছি, পাথরে ঠোকর খাচ্ছি। পড়ে গিয়ে হাতের তালু ছড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে চারধারে নজর বুলালাম। ছায়া, শুধু ছায়া সারি সারি। পাইনের জঙ্গল ভেদ করে শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। এবার আরেকটা শব্দ আমার মনোযোগ কেড়ে নিল। বাতাসে কেউ যেন চাবুক আছড়াল।

দড়াম করে আমার পিঠে এসে পড়ল সিংহ-গাছটির কাটা গুঁড়ি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। নিজেকে টেনে দাঁড় করিয়ে ঘুরে চাইলাম।

মুহূর্তের জন্য ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। ঘন পাতার কারণে নিরেট দেখাচ্ছে ডানা দুটো। হাঁ করল ওটা। জোর বাতাসে পাতার কাঁপুনির যে প্রচণ্ড শব্দ উঠল, কানে হাত চাপা দিতে হলো আমাকে।

এবার সহসা যেমন এসেছিল তেমনি মিশে গেল রাতের আকাশে।

পক্ষীরাজ সিংহটা এখনও জঙ্গলে ঢোকেনি। স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাকপ্যাকটা পিঠ থেকে নামালাম।

তিন নম্বর ঠোঙাটা পেলাম না। তার বদলে আবিষ্কার করলাম ব্যাকপ্যাকের একটা কোনা ছেঁড়া। ভিতরে হাত ভরে পকেট লাইটটা খুঁজে নিলাম। এবার ব্যাকপ্যাকটা ধপ করে পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। হাতড়ে হাতড়ে বোনমিলের তৃতীয় ঠোঙাটা খুঁজছি।

সিংহ-গাছটার আবার ফিরে আসবার শব্দ পেলাম। দ্রুত হাতড়াচ্ছি। পাথরে-মাটিতে ঘষা খাচ্ছে হাত। লাইট জ্বালবার সুযোগ পেলাম না। শোঁ-শোঁ আওয়াজটা তেজাল হয়েছে। মাথার উপরে ঝম-ঝম শব্দ।

মাটিতে ডাইভ দেব জানত ওটা। ফলে, নেমে এল সাঁ করে। আমার জ্যাকেটে জড়িয়ে গেল কী যেন। টান দিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে আমাকে, টের পেলাম। শরীর মুচড়ে গ্রিপার খুলবার চেষ্টা করছি। শেষমেশ খুলতে পারলাম। মাটি থেকে পা দুটো শূন্যে ভেসে উঠেছে, এ সময় গা থেকে জ্যাকেটটা খসিয়ে ফেললাম। পরমুহূর্তে মাটিতে ধুপ করে পড়ে কুঁকড়ে গেলাম। আমাকে কতখানি উঁচিয়েছিল ওটা? মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। এর পরের বার আর ভুল করবে না ওটা, টানাটানি করবে না কাপড় ধরে। শরীরে স্রেফ দাবিয়ে দেবে শাণিত নখর।

চোখ থেকে চুল আর ঘাম সরিয়ে মাটি হাতড়াতে লাগলাম। ব্যাগটা গেল কোথায়!

হুশ করে বাতাসে শব্দ তুলল গাছের পাতা।

কাগজে চেপে বসল আমার আঙুল। পুরানো খবরের কাগজ নাকি অন্য কিছু

ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না সে মুহূর্তে। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুঁড়ে মারলাম। পরক্ষণে মাটিতে বাড়ি খেল আমার পিঠ। চাঁদটাকে আড়াআড়ি পাশ কেটে জঙ্গলে উড়ে গেল ঠোঙাটা। চাঁদ ঢাকা পড়ল সিংহ-গাছটার ডানার আড়ালে। অপেক্ষা করছি। এবার কাত হয়ে ভাসতে দেখলাম ডানা দুটোকে। বনের গাছ-পালার উদ্দেশে উড়ে গেল সিংহ-গাছটা।

'রবিন? রবিন?'

কিশোরের গলা শুনে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম।

পরমুহূর্তে, শুকনো পাতার মচ-মচ শব্দ করে আমার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন। উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে ব্যথা। বনভূমির দিকে হাঁটা দিলাম। বন্ধুদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, 'আমি চিৎকার-টিৎকার দিলে দৌড় দিয়ো। কাজ হলো কিনা দেখে আসি।'

চাঁদের আলোয় সব কিছু সাদা-কালো দেখাচ্ছে। কাঁপা হাতে পকেট লাইটটা জ্বাললাম। আলো জ্বলল না দেখে তালুতে বাড়ি দিলাম। এবার ম্লান এক চিলতে আলোর রেখা ফুটল।

পায়ের নীচে ভাঙছে পাইনের কাঁটা। শান্ত থাকবার চেষ্টা করছি। ডাল-পালার নানা রকম শব্দ কানে আসছে। হাঁটা দিলাম শব্দ লক্ষ্য করে। হাত কাঁপছে, ফলে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে আলোটা।

খানিকটা ফাঁকা মত জমিতে অন্যান্য গাছ-গাছালির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ওগুলো। স্বাভাবিক গাছের মত দিব্যি দুলছে। এমনকী পক্ষীরাজ সিংহটাকেও ওখানে দেখলাম। হাঁটু মুড়ে বসে লক্ষ করছি। মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে। শাখা-প্রশাখা মাটি খুঁড়ে ইঁদুরের মত গর্তে ঢুকছে। গাছ-জন্তুগুলো শরীর মুচড়াচ্ছে, এবং তার ফলে ওদের আকৃতি বদল হচ্ছে। জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক গাছের রূপ ধরছে ওরা। আশা করা যায় আর সব গাছের মত স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে এবার। কেননা আর তো কেউ গবেষণা করবে না ওদেরকে নিয়ে। কাজেই জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে কোন মিলও পাওয়া যাবে না এখন থেকে। ডালের খটাখটি থেমে গেল। মাটি খোঁড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা পেঁচা ডেকে উঠল। এবার বাতাসে যে শব্দ উঠল, সেটি পাতার স্বভাবজাত মর্মরধ্বনি। এবং পাইনের দীর্ঘশ্বাস।

আমিও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলাম বন্ধুদের। ওরা আমাকে একা ছেড়ে নিশ্চিত হতে পারেনি। পিছু-পিছু চলে এসেছে। বুকটা ভরে গেল।

*

পরদিন স্যালির সঙ্গে ওদের বাসায় দেখা করতে গেলাম। আমাদেরকে দেখেও হাসল না ও।

'দু'হপ্তার জন্য আমার বাইরে বেরনো নিষেধ,' বলল।

ওর পাশে বসতে গিয়ে 'উহ্' করে উঠলাম। গায়ের ব্যথা কমেনি।

'আমরা কোথায় গেছিলাম বলতে গেলে কেন?'

ও জবাব দেওয়ার আগেই যুম্যানের বাসার সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমরা মুখ তাকাতাকি করলাম। উঠে দাঁড়িয়ে সোজা নীচে নেমে এলাম। হেঁটে গেলাম রাস্তার ওপাশে।

নার্সের সাহায্য নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন যুম্যান। হাতে প্রকাণ্ড এক লাঠি।

'আচ্ছা, কিশোর, গাছগুলো হঠাৎ অমন খেপে উঠল কেন?' মুসা জানতে চাইল।

'ইদানীং উনি হয়তো ঠিক মত খাবার দিতে পারছিলেন না। যে কারণে খেপে উঠেছিল ওগুলো,' ব্যাখ্যা করল কিশোর। 'ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। আর ড্যানিরা উপড়ে তোলায় পোয়াবারো হয়ে গেছিল গাছগুলোর। আক্রমণ শুরু করেছিল।'

'ভদ্রলোক ইয়ার্ডের দশা দেখে কেঁদেই ফেলেন কিনা কে জানে,' বলল স্যালি। নিষেধ ভুলে ও-ও চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে।

যুম্যান লাঠি ভর দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। গেটের কাছে এসে থমকে গেলেন। চেয়ে রয়েছেন একদৃষ্টিতে। এবার নার্সের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'এটা আমার বাড়ি তো?' অনিশ্চিত কণ্ঠে বললেন।

নার্স মাথা ঝাঁকালেন।

বাড়ির দিকে চাইলেন উনি।

'কী অযত্ন! অদ্ভুত লাগছে। হাসপাতালে শুয়ে গাছের স্বপ্ন দেখতাম অথচ বাড়ি ফিরে দেখি মরুভূমি।' এগোতে গিয়ে থেমে গেলেন আমাদেরকে দেখে। স্যালিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হাল্লো, তোমাকে চেনা-চেনা লাগছে। আমি চার্লস ব্যানারম্যান।'

এক লাফে তাঁর কাছে চলে গেল স্যালি।

'হাই, আমি স্যালি। আর এরা আমার বন্ধু কিশোর, মুসা আর রবিন।'

আমরা একে একে বৃদ্ধের সঙ্গে হাত মেলালাম।

'আপনি চাইলে আমরা আপনার ইয়ার্ড পরিষ্কার করে দিতে পারি,' প্রস্তাব করলাম আমি।

হাসি মুখে মাথা নাড়লেন উনি।

'ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে তোমাদের চায়ের দাওয়াত। কাল বিকেলে আমার বাসায় আসছ তোমরা।'

সানন্দে রাজি হলাম আমরা। পেটে হাত বুলাল মুসা। হাসি দু'কান অবধি ঠেকেছে।

***